# রহিতে নারিনু ঘরে

শ্রী কালীপদ ঘটক

মিত্রালয়
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কবি ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

প্রিয়বরেষু—

"আমার লেখার পাতে পাতে
অনিমেষ [illegible] [illegible]র আঁখি,
সেই ভালোবাসাটির সাথে
এইখানে হোক মাখামাখি।"

প্রীতিমুগ্ধ—
শ্রীকালীপদ ঘটক

# কীর্ত্তনীয়া শ্রীবিলাস

চণ্ডীদাসের পদাবলী ও তাঁর জীবনচরিত পাঠ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কতকটা ধারণা লাভ করিয়াছি। তাঁহার বাসভূমি ও আরাধ্যা বাশুলী দেবীর মন্দির বীরভূমের নান্নুরে অথবা বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে অবস্থিত ছিল, কিম্বা বঙ্গদেশের অপর কোন অজ্ঞাত অঞ্চলে লোক-লোচনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকায় আসলে তাহা আজ পর্য্যন্ত অনাবিস্কৃতই রহিয়া গিয়াছে, এ প্রশ্ন লইয়া কোন দিন মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন বোধ করি নাই। চণ্ডীদাসের ভিটায় কয়টা তালগাছ ছিল, অথবা তস্য ভ্রাতা নকুল ঠাকুর মুগ্ধবোধ পড়িয়াছিলেন কি-না, এতকাল পরে নিঃসন্দেহে তা প্রমাণ করা শক্ত। প্রেমরসাত্মক অমর পদাবলীর রচয়িতা আদি-রসের ভিয়ানে ফেলিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন পাক করিলেন কোন্ দুঃখে, অথবা কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবির পক্ষে পদাবলী রচনা আদৌ সম্ভবপর কি না, এসব কূট প্রশ্নের জবাব দেওয়াও সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। শুধু এই টুকুই বলিতে পারি, এ বিষয়ে যাঁহারা রকমারি গ্রন্থ ঘাঁটিয়া ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে চান,

তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোন অনুযোগ নাই। দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, অনন্ত ও বড়ু চণ্ডীদাসের সমস্যা লইয়া যত খুশি তাঁহারা তর্কবিতর্ক করিতে থাকুন, কিন্তু আসল কথা হইল—ও-সব জটিল বিতর্কের মধ্যে নিজেকে না জড়াইয়াও চণ্ডীদাসকে চিনিতে আমাদের কষ্ট হয় না, এক কথায় কবি চণ্ডীদাসকে আমরা চিনি। শুনিয়াছি তাঁহারই উপর বাশুলী দেবীর নিত্য-সেবার ভার ছিল। কবি নাকি থেলো হুঁকায় তামাক খাইতেন, ধোপাপুকুরে ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতেন, ভাবাবেশে বিভোর হইয়া প্রেমরসাত্মক কাব্য লিখিতেন। চণ্ডীদাসের মোটামুটি এই পরিচয়টুকুই আমাদের নিকট যথেষ্ট। রজকিনী রামীর অনাবিল চণ্ডীদাস-প্রীতি ও চণ্ডীঠাকুরের 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম' ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের পদগুলি বিস্ময়কর এক গভীর রসতত্ত্বের চরম নিদর্শন, একথা বহুপূর্ব্বেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু থাক্ সে কথা, রামী চণ্ডীদাসের গভীর প্রেমতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিবার জন্য লেখনী ধারণ করি নাই, বলিতেছিলাম আমাদের শ্রীবিলাসের কথা।

শ্রীবিলাস মুখোপাধ্যায়, ডাক নাম তার বিলাস। সুন্দর চেহারা, গায়ের রঙ ফর্সা, মাথায় একমাথা বাবরি চুল। সহরের ইস্কুলে লেখাপড়া শিখিতে গিয়া শ্রীবিলাস আর কিছু শিখুক বা না শিখুক, বেশভূষার পারিপাট্য ও সভ্য সমাজের চালচলন সে রীতিমত আয়ত্ত করিয়া গ্রামে ফিরিয়াছে। বিদ্যাবুদ্ধির দিক দিয়া দেখিতে গেলেও শ্রীবিলাসকে নেহাৎ মন্দ ছেলে বলা চলে

না, কারণ ঠেলিয়া ঠুলিয়া কোন রকমে সে হাই ইস্‌কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত গড়াইয়া গিয়াছিল। শ্রীবিলাসের দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক, কিম্বা অপর কোন অজ্ঞাত কারণেই হোক, ইস্‌কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ঠিক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তৃতীয় শ্রেণীতেই উপর্য্যুপরি তাহাকে তিনটি বৎসর আবদ্ধ করিয়া রাখেন। ফলতঃ মা সরস্বতীর সেরেস্তা হইতে নাম খারিজ করাইয়া শ্রীবিলাস শেষ পর্য্যন্ত পাততাড়ি গুটাইতে বাধ্য হয়। কেহ কেহ আবার এমন কথাও বলিয়া থাকে যে বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের সহিত কি যেন একটা বিষয় লইয়া শ্রীবিলাসের কিঞ্চিৎ মতান্তর ঘটায় ক্রমশ তাহা ঘোরতর মনান্তরে পরিণত হয় এবং সেই সূত্রেই শ্রীবিলাস নাকি রাতারাতি একদিন কাঁচি সংযোগে নিদ্রিত স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের শিরোদেশ হইতে তাঁর পরিপুষ্ট চৈতন গুচ্ছটি বেমালুম কোথায় সরাইয়া ফেলে। উক্ত টিকিহারা পণ্ডিত প্রবরের খড়মাঘাত-আতঙ্কই নাকি শ্রীবিলাসের বিদ্যালয় বর্জ্জনের একমাত্র কারণ। এ-সব তার পঠদ্দশার কাহিনী।

সে যাহাই হোক, এ লইয়া আর শ্রীবিলাসকে কোন দিন হা-হুতাশ করিতে দেখা যায় নাই। গ্রামের মধ্যে তার পসার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। ছোট বড় সকলেই তাহাকে মান্য করিয়া চলে, বিশেষ করিয়া তরুণের দল শ্রীবিলাসের একেবারে মুঠার মধ্যে; শ্রীবিলাস তাহাদের নেতৃস্থানীয় গুরুজন, শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। গ্রামস্থ প্রাচীনদলভুক্ত কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তি

কিন্তু এই বে-পরোয়া ডাংপিটে ছোকরাটিকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখে না, কেন তাহা তাহারাই জানে। শ্রীবিলাসের গুণাবলীর বিশ্লেষণ করিয়া কেহ কেহ তাহার নাম দিয়াছে বোম্বেটে, কেহ বলে অকাল-কুষ্মাণ্ড, কেহ কেহ বা আরও একটু বেশি-রকম গুণগ্রাহিতার পরিচয় স্বরূপ তাহাকে অবধূত আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে।

ছেলেবেলা হইতেই শ্রীবিলাস একটু সঙ্গীত-প্রিয়। নিয়মিত ভাবে গলা সাধিয়া ও গান গাহিয়া এ বিষয়ে যৎসামান্য দক্ষতাও সে অর্জ্জন করিয়াছে। শ্রীবিলাসের এই সঙ্গীতচর্চ্চার মূলে তাহার এক জ্ঞাতিখুড়া জগৎ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, শ্রীবিলাসের আদিগুরু তিনিই। জগৎ মুখোপাধ্যায় নিজে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়ক ছিলেন। তাঁর নিজের হাতে গড়া নামকরা একটি সঙ্কীর্ত্তনের দল ছিল, দলটি অল্পদিনের মধ্যেই পল্লী-অঞ্চলে বেশ পসার জমাইয়া ফেলে; শ্রীবিলাস সবে তখন পাঠশালার ছাত্র। জগৎ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীবিলাসকে একটু বেশি রকম স্নেহ করিতেন বলিয়াই ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে কীর্ত্তন সম্প্রদায়ে ভিড়াইয়া লন এবং যত্ন পূর্ব্বক কীর্ত্তনাঙ্গ সঙ্গীত ও খোলবাদ্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু শ্রীবিলাসের যৎসামান্য শিক্ষালাভের পরই জগৎ মুখোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যু বশতঃ সম্প্রদায়টি হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায়। অতঃপর শ্রীবিলাসও খোলকীর্ত্তন ছাড়িয়া একটু বেশি বয়সেই উচ্চশিক্ষালাভের আশায় ইংরাজী ইস্কুলে গিয়া যথানিয়মে হাজিরা দিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

হাই ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার পর শ্রীবিলাসের সঙ্গীতচর্চ্চা সাময়িকভাবে কিছুটা ব্যাহত হইলেও ও-বিষয়ে অনুরাগ তার কোন দিনই শিথিল হয়নি। এ সব তার ছেলেবেলার কথা, কিন্তু আজো এই ছাব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত স্বর্গীয় জগৎ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত কীর্ত্তনাঙ্গ পদগুলি শ্রীবিলাস কোন ক্রমেই ভুলে নাই, পরন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু নূতন পদ সংগৃহীত হইয়াছে, বহুবিধ রাগরাগিনীও সে মোটামুটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়। শ্রীবিলাস হামেশাই গুন্ গুন্ করিয়া নিজের মনে কীর্ত্তনের স্থর ভাঁজে, এটা তার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মাঝে সে একবার স্বর্গীয় জগৎ মুখোপাধ্যায়ের অনুকরণে নিজস্ব একটি কীর্ত্তন সম্প্রদায় খুলিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত দোঁহারের অভাবে সে সঙ্কল্প তার কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠে নাই; বাধ্য হইয়া শ্রীবিলাসকে পরিকল্পনাটি ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

শ্রীবিলাস ডাকসাইটে কুলীন-বংশের ছেলে। তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের কৌলিন্য গৌরব ও বহু বিবাহের কথা গল্পচ্ছলে এই পল্লী অঞ্চলে আজ পর্য্যন্ত অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। নৈকষ্য-শিরোমণি পরম কুলীন শ্রীবিলাসের প্র-পিতামহ নাকি একে একে ছাপ্পান্নটি না-বালিকার পানি গ্রহণ করিয়া তাহাদের অভিভাবকগণকে কুলভঙ্গ মহাপাতক হইতে ত্রাণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিলাসের পিতামহ উক্ত বিষয়ে ঠিক অতখানি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ না হইলেও পূর্ব্বপুরুষের কৌলিন্য-

গর্ব্বকে তিনিও একেবারে খর্ব্ব করিয়া যান নাই। শ্রীবিলাসের পিতাঠাকুর পর্য্যন্ত সে ধাক্কা কিছুটা ঠেলিয়া আসিয়াছিল, কালক্রমে সেইখানে আসিয়াই থিতাইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে আলোচনা থাক্, পিতৃপুরুষগণের প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। তাঁহারা সব একে একে বহুপূর্ব্বেই এই নশ্বর জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের একমাত্র বংশধর শ্রীমান শ্রীবিলাস পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত ভিটেখানিকে আশ্রয় করিয়া বিধবা পিসি ক্ষান্তমণির স্নেহযত্নে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। সংসারে তার আপনার বলিতে একমাত্র এই ক্ষান্ত পিসি ছাড়া আজ আর কেহ বাঁচিয়া নাই। ছেলেবেলা হইতে ক্ষান্তমণিই তাহাকে মানুষ করিয়াছে। বাপ মার কথা মনে পড়ে না শ্রীবিলাসের, জ্ঞান হওয়া অবধি ক্ষান্তমণিকেই সে মায়ের মত দেখিয়া আসিতেছে।

ক্ষান্তমণির একমাত্র বন্ধন এই শ্রীবিলাস। তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য কি আপ্রাণ চেষ্টাই না সে করিয়া আসিতেছে। কিন্তু শ্রীবিলাসকে লইয়া ক্ষান্তমণিরই বা স্বস্তি কোথায়! মানুষের মত মানুষ সে আর হইল কই, সংসারে কি তার মতি আছে! দিনরাত শুধু আড্ডা মারিয়া, গান গাহিয়া, আর খোল বাজাইয়াই শ্রীবিলাস নিশ্চিন্ত। সংসারের সকল দায়িত্ব সকল ঝক্কি ক্ষান্তমণির উপর। শ্রীবিলাসকে লইয়া ক্ষান্তমণি একটু দুর্ভাবনায় পড়িয়াছে, যেমন করিয়া হোক শ্রীবিলাসের এবার বিবাহ দিতে হইবে, নতুবা তার শোধরাইবার কোন আশা নাই।

দেখিতে দেখিতে বয়সও প্রায় হইয়া গেল এক কুড়ি ছয়, বিবাহ সে আর কখন করিবে !

সকাল বেলা হইতেই একটু একটু মেঘ করিয়াছে। ক্ষান্তমণি শ্রীবিলাসের প্রতীক্ষায় রান্নাঘরের দাওয়ার উপর চুপচাপ হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে। শ্রীবিলাস গিয়াছে হাট বাজার করিতে, রান্নার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হইতে চলিল, তবু তার বাড়ী ফিরিবার নাম নাই। ক্ষান্তমণি শ্রীবিলাসের উপর কুপিত হইয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীবিলাস হয়ত এতক্ষণ বাঁকা নন্দীর দোকানে বসিয়া তাস পিটাইতেছে, কিম্বা হয়ত পাড়া ছাড়িয়া অপর কোথাও গিয়া আড্ডা জমাইয়াছে। সময়ের মাত্রাজ্ঞান যদি এতটুকু থাক্ ! কাজের চেয়ে অকাজ লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে সে ওস্তাদ।

কিছুক্ষণ পর দূর হইতে হঠাৎ শোনা গেল কীর্ত্তনের স্বর :—

'কি দারুণ বুকে ব্যথা।

আমি সেই দেশে যাব যে দেশে না শুনি পাপ পিরীতি কথা' ॥

শ্রীবিলাস হাট বাজার সারিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। কতকগুলা তরিতরকারি দাওয়ার উপর নামাইয়া দিয়া শ্রীবিলাস ক্ষান্তমণির দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল,—পিসি, আজ গরম গরম খিচুড়ি খেতে হবে ; বেশ ক'রে লাগা দেখি আজ ঘুনি-খিচুড়ি, বাদলটা কি রকম ঝেঁপে আসছে দেখেছিস !

ক্ষান্তমণি কহিল,—সকাল থেকে ছিলি কোন্ চুলোয় ? এদিকে যে আমার তিনটি উনোন কয়লা পুড়ে ছাই হয়ে গেল সে দিকে একটু হুঁস আছে ! দিনরাত খালি আড্ডা, আর আড্ডা !

শ্রীবিলাসের প্রতীক্ষায় ইতিমধ্যে যে ক্ষান্তমণির তিনটি উনান কয়লা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য শ্রীবিলাস কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করিল না। ক্ষান্তমণির কথার কোন জবাব না দিয়া কামাইবার সাজসরঞ্জাম লইয়া সে দাড়ি কামাইতে বসিল। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। শ্রীবিলাস গালে সাবান ঘষিতে ঘষিতে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল :—

'এ সখি, হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর'॥

মরি মরি, বৈষ্ণব কবি কি পদই লিখিয়া গিয়াছেন,—'শূন্য মন্দির মোর!'

ক্ষান্তমণি তখন উনানে কতকগুলা কয়লা ফেলিয়া দিয়া তরকারি কুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীবিলাসের 'শূন্য মন্দির মোর' শুনিয়াই হোক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হোক, মোলায়েম কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল,—বাবা বিলেস, এবার একটা বে-থা কর বাবা! আমি কিন্তু একলা এই সংসারের ঝামেলা আর সামলাতে পারছি না।

শ্রীবিলাস গান ছাড়িয়া জবাব দিল,—কি যে তুই বলিস পিসি, বিয়ে ক'রে খাওয়াব কি!

ক্ষান্তমনি বলিল,—রোজ রোজ সেই এক কথা. ও সব বাজে ওজর আমি শুনতে চাই না, অভাবটা তোর কোন্ জায়গায় শুনি? বিশ পঁচিশ বিঘে বেহ্মোত্তর, পুকুর বাগান কোঠাবাড়ী—

ক্ষান্তমণির কথায় বিশেষ কান দিল না শ্রীবিলাস, কান দিয়া কোন লাভও নাই, এসব কথা অনেক বারই শোনা হইয়া গিয়াছে। চটপট দাড়ি কামানো শেষ করিয়া মাথায় খানিকটা তেল রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে শ্রীবিলাস গলাটা আর একটু চড়াইয়া দিল :—

'তিমির দিগ ভরি ঘোরা যামিনী'—

ক্ষান্তমণি একটু বিরক্ত হইয়া বলিল,—রেখে দে তোর ঘোরা যামিনী, ও সব বাজে কথা আমি আর শুনছি না বাছা! রাইজী মশায় একটি খুব ভাল পাত্রীর সন্ধান দিয়ে গেছে, যেমন ক'রে হোক আসছে অঘ্রাণেই—

শ্রীবিলাস ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—তাই নাকি, তা হলে ত সব ঠিকঠাক; তা এই মাসেই হয়ে যাক না,—মেয়েটির বয়স?

ক্ষান্তমণি একটু গম্ভীর হইয়া বলিল,—হাসির কথা নয় বিলেস! মেয়েটি শুনছি খুব সুন্দরী,—যেমন তার গায়ের রঙ, তেমনি তার—

শ্রীবিলাস একটু বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বলিল,—বলিস্ কি পিসি, একেবারে 'অথির বিজুরিক পাঁতিয়া'!

শ্রীবিলাস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভাবী-বধূর বর্ণনাপ্রসঙ্গে এইভাবে বাধা পাইয়া ক্ষান্তমণি রীতিমত চটিয়া গেল। শ্রীবিলাস আবার গান ধরিয়াছে :—

'তিমির দিগ ভরি ঘোরা যামিনী অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।

বিদ্যাপতি কহে'...

ক্ষান্তমণি রাগে হঠাৎ গর্জ্জিয়া উঠিল,—কি কহে, বিদ্যাপতি কি কহে শুনি? দিনরাত খালি 'বিদ্যাপতি কহে' আর 'চণ্ডীদাস গাহে'—এই করেই পেট ভরবে নাকি, লক্ষীছাড়া ভূত কোথাকার!

শ্রীবিলাস তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—পিসি—পিসি, রান্নাঘরে বেরাল ঢুকেছে; ঐ যাঃ—দুধের কড়াটা ওল্টালো বুঝি!

ক্ষান্তমণি সামনের ঝাঁটা গাছটা কুড়াইয়া লইয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—যাই—যাই আঁটকুঁড়ীর বেরালকে!

কিন্তু কোথায় বেরাল! সারা রান্নাঘর খোঁজাখুঁজি করিয়াও ক্ষান্তমণির চর্ম্মচক্ষে কোন চতুষ্পদেরই সন্ধান মিলিল না। বেরাল কুকুর ত দূরের কথা, নেংটি একটা ইঁদুর পর্য্যন্ত না; দুধের কড়া যেমনকার ঠিক তেমনিটি ঢাকা দেওয়া আছে। ক্ষান্তমণি শ্রীবিলাসের উপর খাপ্পা হইয়া উঠিল, রান্নাঘরের ভিতর হইতেই জোর গলায় একটা হাঁক দিয়া কহিল,—ওরে ও হতচ্ছাড়া হনুমান!

শ্রীবিলাস ততক্ষণ কাঁধে গামছা ফেলিয়া পদ্মবাঁধে স্নান করিবার জন্য তাড়াতাড়ি রওনা হইয়া গিয়াছে।

# ছায়াচিত্রে

মকর-সংক্রান্তি উপলক্ষে পথে ঘাটে স্নান-যাত্রীর ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। রেল-কোম্পানীর গাড়ীগুলি মফঃস্বলের যাত্রীতে পরিপূর্ণ। পুণ্যকামী পল্লী-বাসিগণ রেলগাড়ীর অতিরিক্ত ঠাসাঠাসির মধ্যেও হৈ-হুল্লোড় ও গল্পগুজব করিতে করিতে পরমানন্দে তীর্থ করিতে চলিয়াছে। মা-গঙ্গার শীতল জলে মাথা ডুবাইয়া ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণের সৌভাগ্য জীবনে তাদের বড় বেশি হয় না, তাই তীর্থগামী এই যাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভাবটা কিছু প্রবল। সংসারের খোঁটা হইতে গেরো ফস্‌কাইয়া কোন ক্রমে যাহারা দুই এক-দিনের জন্য ঘর-সংসার ভুলিয়া তীর্থের টানে উধাও হইয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদের এই অপরিসীম আনন্দের পরিমাপ করিবে কে! রেলগাড়ীর অসুবিধা তাহারা গায়ে মাখে না, কোন রকমে কামরার মধ্যে মাথা গলাইয়া ঠেলাঠেলি ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে করিতে যে যার আপনার ঠাঁই করিয়া লইয়াছে। কেহ চলিয়াছে কাটোয়া, কেহ বা আজিমগঞ্জ, কাহারো লক্ষ্য ত্রিবেণী-সঙ্গম, কেহ কেহ বা রওনা হইয়াছে অপর কোন জায়গায়।

ক্ষান্তমণির নবদ্বীপ যাইবার ইচ্ছা ছিল, শ্রীবিলাস কিন্তু বরাবর তাহাকে মেইন লাইন দিয়া সোজা একেবারে কালীঘাটে লইয়া গিয়া হাজির করিল। কলিকাতা মহানগরী মস্ত একটা রাজধানী

জায়গা, টাকা পয়সা খরচ করিয়া পিসিমার গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থাটুকু যদি করিয়া দিতেই হয়, তাহা হইলে আর মগরা বা নবদ্বীপ কেন, শ্রীবিলাসের পক্ষে কলিকাতাই প্রশস্ত। ক্ষান্তমণির গঙ্গাস্নান ও শ্রীবিলাসের কলিকাতা দর্শন, একসঙ্গে দুই কাজই হইয়া যাইবে, মন্দ কি!

ক্ষান্তমণির কিন্তু মনে মনে একটু আশঙ্কা ছিল, পাড়াগাঁয়ের লোকেরা কলিকাতায় আসিয়া নাকি পথঘাট ঠিক ঠাহর করিতে না পারিয়া যেখানে সেখানে গলিঘুঁজির মধ্যে হারাইয়া যায়। তার উপর চোর গুণ্ডা গাঁটকাটার উপদ্রব ত আছেই। শ্রীবিলাস তাহাকে অনেক করিয়া ভরসা দিয়া কালীঘাট পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। মায়ের মন্দির বাঁয়ে রাখিয়া ক্ষান্তমণিকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবিলাস গিয়া উঠিল একটা ধর্ম্মশালায়। ক্ষান্তমণি কিছুটা নিশ্চিন্ত হইল। শ্রীবিলাস যখন সঙ্গে আছে, তখন আর ভাবনা চিন্তার কারণ কিছু নাই। কালীঘাট দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে যদি সম্ভব হয় নবদ্বীপ হইয়া ঘুরিয়া গেলেই চলিবে, শ্রীবিলাসও ক্ষান্তমণির সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত।

মকর-সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে আদিগঙ্গায় মাথা ডুবাইয়া ক্ষান্তমণি কতখানি পুণ্য সঞ্চয় করিল—চিত্রগুপ্তের খসড়া খতিয়ানে তার মোটামুটি একটা হিসাব নিকাশ অবশ্যই নোট করা থাকিবে। কিন্তু শ্রীবিলাস এবার কলিকাতায় আসিয়া যে অপরিমেয় আনন্দ ও অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া গেল, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। ক্রমে সে-কথা বলিতেছি।

কালীঘাটের মন্দির, আলিপুরের চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল ও গড়ের মাঠ দেখিয়া ক্ষান্তমণির তাক লাগিয়া গিয়াছে। ইহাই তাহার প্রথম কলিকাতা দর্শন। শ্রীবিলাস অবশ্য ইতিপূর্ব্বে আর একবার আসিয়াছিল। গড়ের মাঠ দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে মনুমেণ্টের দিকে চাহিয়া ক্ষান্তমণি জিজ্ঞাসা করিল,—লম্বা-মত ওই গম্বুজটা কিসের বিলেস, শিবেলয়ের চূড়ো নাকি?

শিবালয়ের চূড়াই বটে!

শ্রীবিলাস জবাব দিল,—না-গো না, ওটার নাম হচ্ছে মনুমেণ্ট—অক্টারলোনি মনুমেণ্ট। নবাব সিরাজ উদ্দৌলার নাম শুনেছিস? শুনিসনি,তা বেশ। সেই নবাব এক সময় কতকগুলো ইংরাজ সৈন্যকে ছোট একটা ঘরের মধ্যে বন্দী ক'রে রেখেছিলো; লোকগুলো হঠাৎ সেই অবস্থায় মারা পড়ে যায়, আর ওই মনুমেণ্টের নীচে তাদের কবর দেওয়া হয়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সেই কবরের উপর একটা স্মৃতি-স্তম্ভ খাড়া ক'রে দিয়েছে। এ সব কাহিনী আমরা ইতিহাসে পড়েছি কি না।

ধন্য সে ইতিহাস, আর ধন্য এ শিক্ষা!

শ্রীবিলাস যে খুব বুদ্ধিমান ছেলে এবং দেশ বিদেশের সব কিছু তার নখদর্পণে, এ ধারণা ক্ষান্তমণির বরাবরই আছে। পাঁচজনের কাছে গৌরব করিয়া সে বলিয়াও থাকে,—বিলেস আমাদের 'এন্‌টেনেস' পাশ।

আরও কিছুটা হাঁটিয়া গিয়া শ্রীবিলাস একটু ক্লান্ত হইয়া বলিল,—থাম্‌ পিসি, ঝাঁ ক'রে এক গ্লাস সরবৎ খেয়েনি।

'হোয়াইটওয়ে লেড্‌লো'র সামনে ট্রামলাইনের পশ্চিমধারে ছোট্ট একটা দোকান দেখিয়া শ্রীবিলাস। সরবৎ খাইতে বসিল। ক্ষান্তমণি রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া চারিদিক বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, হাজার হাজার ইট পাথরের বাড়ী এখানে তৈয়ার করিল কে? চারিদিকে এত লোকজনের ছুটাছুটি হুটাপুটিই বা কেন! এরা সব কোন্ মুলুকের লোক? কেনই বা হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া একসঙ্গে সব ভিড় জমাইয়াছে! ক্ষান্তমণি মনে মনে ভাবে,—পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষে তবে কি ইহারা দূর-দূরান্তর হইতে এখানে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছে? কিন্তু না, গঙ্গার ঘাটে ত ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ইহাদের চলাফেরা ও চাল চলনের মধ্যে তীর্থযাত্রীর কোন লক্ষণই নাই। ইহারা তবে কাহারা? কি জন্য এমন ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে দুপুর রোদে বে-ধড়ক্কা ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে! হরেক লোকের হরেক রকম পোষাক, কে জানে লোকগুলো সব কি জাত! মেলেচ্ছো নাকি? বামুন কায়েত নবশাখা বলে ত মনে হয় না।

ক্ষান্তমণি অবাক বিস্ময়ে জন-সমুদ্রের ঢেউ গণিতে লাগিল। কলিকাতার এই ট্রামগাড়ী, এও এক তাজ্জব ব্যাপার। কোথা হইতে যে কেমন করিয়া কে ও-গুলাকে চালাইতেছে,—আশ্চর্য্য! সে যা-ই হোক, দুনিয়ার এই আজব কারখানা দেখিয়া শুনিয়া ক্ষান্তমণির চোখ দু'টি কিন্তু আজ সার্থক হইয়া গেল। ভাগ্যিস্ সে শ্রীবিলাসের অনুরোধে পড়িয়া কালীঘাট পর্য্যন্ত আসিয়া

পড়িয়াছিল। কথায় বলে,—যে কলকাতা দেখেনি সে নাকি মায়ের গর্ভেই আছে। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়।

একজন হিন্দুস্থানী হকার ক্ষান্তমণির আশেপাশে 'রেস্‌গাইড্‌' ফেরি করিয়া বেড়াইতেছিল। ক্ষান্তমণি একটু আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হাঁগা বাছা, অষ্টোত্তর শতনাম আছে?

হিন্দুস্থানী হকার ক্ষান্তমণির দিকে চাহিয়া একটু বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠিল,—কিয়া?

ক্ষান্তমণি কহিল,—অষ্টোত্তর শতনাম গো, ঠাকুর-নামের পুঁথি।

হকার একটু নাক সিট্‌কাইয়া জবাব দিল,—নেহি—নেহি—ঠাকুর আকুর নেহি হ্যায়।

এই বলিয়া সে রেস খেলোয়াড় খরিদ্দারের খোঁজে ট্রাম লাইনের দিকে আর একটুখানি আগাইয়া গেল। এমন সময় কালীঘাট ও শ্যামবাজারগামী দুইখানি দো-তলা বাস দ্রুতবেগে পরস্পরের সম্মুখীন হইতেই ক্ষান্তমণি ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, ঐ যাঃ—এইবার দুইটাতে ঢুঁস্‌ লাগিয়া গেল বুঝি! কিন্তু না, ঢুঁস্‌ ত কই লাগিল না, যে যার আপনার পাশ কাটাইয়া সচ্ছন্দে চলিয়া গেল। ধন্য ইহাদের সাহস বলিতে হইবে!

অহেতুক আশঙ্কায় ক্ষান্তমণির এক চমক রক্ত শুকাইয়া গিয়াছিল।

চৌরঙ্গী রোডের উপর গগনস্পর্শী অট্টালিকাগুলির দিকে ক্ষান্তমণি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। সামনে দিয়া অসংখ্য মোটর গাড়ী হর্ণ্‌ বাজাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ক্ষান্তমণি মনে মনে ভাবে,

আমাদের বিলেসের যদি এমনি একটি হাওয়াগাড়ী থাকিত, আর এই রকমের ঝকঝকে তকতকে চারতলা একখানা বাড়ী। তাহা হইলে কি চমৎকারই না হইত।

ট্রামলাইনের ধারে ভাঙ্গা একটা টুলের উপর বসিয়া সরবৎ খাইতে খাইতে শ্রীবিলাসের দৃষ্টি পড়িল ছোট্ট একটা গুমটির দেওয়ালে সাঁটা কতকগুলো সিনেমার বিজ্ঞাপনের উপর। শ্রীবিলাস টুল ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া পরমাগ্রহে পোষ্টারগুলি পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। তার মধ্যে একটায় বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে 'চিত্রা', নীচে লেখা 'চণ্ডীদাস'। তারও নীচে চণ্ডীদাস ছবির সংক্ষিপ্ত পরিচয়, পাশে রামী ধোপানীর একখানি চিত্র।

শ্রীবিলাস সাপ্তাহিক বসুমতীতে চণ্ডীদাস ছবির সমালোচনা পাঠ করিয়াছিল, হেডিংটি এখনো তাহার মনে আছে,—'চিত্রায় চণ্ডীদাস'। আলোচনাটি পড়িয়া শ্রীবিলাসের বেশ ভাল লাগিয়াছিল। ছবিখানি আজ চাক্ষুষ দেখিবার সুযোগ মিলিয়া গিয়াছে, সুতরাং এ সুযোগ কোনমতেই ছাড়া হইবে না। শ্রীবিলাস ক্ষান্তমণির নিকটে গিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল,—চল্ পিসি, আজ তোকে বায়োস্কোপ দেখিয়ে নিয়ে আসি; চিত্রায় চণ্ডীদাস, পালা খুব ভাল।

ধর্ম্মতলার মোড়ে গিয়া শ্রীবিলাস ক্ষান্তমণিকে লইয়া শ্যামবাজারের ট্রামে চাপিয়া বসিল। কণ্ডাক্টারকে বিশেষ ভাবে বলিয়া দেওয়া হইল—চিত্রার সামনে যেন তাহাদিগকে অবশ্যই নামাইয়া দেওয়া হয়।

সিনেমা-হল লোকে লোকারণ্য। ঠেলিয়া ঠুলিয়া কোন রকমে দুইখানি টিকিট কিনিয়া ক্ষান্তমণিকে লইয়া শ্রীবিলাস হলের মধ্যে গিয়া বসিয়া পড়িল। দুই আনা নগদ মূল্যে চণ্ডীদাস ছবির প্রোগ্রাম একখানি সে খরিদ করিয়া ফেলিয়াছে। প্রচ্ছদপটে আবার সেই রামী ধোপানীর চিত্র, দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। লোকজনের সমারোহে সিনেমা-হল সরগরম, শ্রীবিলাস যেন এক নূতন জগতে আসিয়া পড়িয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীর সহিত পূর্ব্ব হইতেই শ্রীবিলাসের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, কিন্তু তার বাস্তব জীবনের বিচিত্র নাট্যরূপ প্রত্যক্ষ করিবার এ সৌভাগ্য শ্রীবিলাসের পক্ষে সত্যই এক অভাবনীয় ব্যাপার। শ্রীবিলাস সাগ্রহে চাহিয়া আছে সামনের পর্দ্দার দিকে, ছবি আরম্ভ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মঞ্চের সম্মুখভাগে দুই ধারে দুইটি হনুমানের ছবি এখানে কে আঁকিল! হনুমান ত পথে-ঘাটে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়,—অজস্র, অসংখ্য; পয়সা দিয়া পটে আঁকা হনুমান দেখিয়া লাভ! কি এ ছবির তাৎপর্য্য? জ্যান্ত হনুমান শ্রীবিলাস অনেক দেখিয়াছে, ক্ষান্তমণি ত শ্রীবিলাসকেই মাঝে মাঝে হনুমান বলিয়া ভুল করিয়া থাকে, ওই নামে তাহাকে সম্বোধন পর্য্যন্ত করিয়া বসে। এ আর এমন নতুন কথা কি! শ্রীবিলাসের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল চিড়িয়াখানার কথা, দর্শনী মাত্র এক আনা। এক আনা দর্শনীর বিনিময়ে শুধু হনুমানই সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না, রকমারি জন্তুজানোয়ার দেখাইবার ব্যবস্থাও আছে। তবে এখানে এতগুলি ভদ্রলোকের সামনে এই ভাবে দুইটি নকল

হনুমান ছাড়িয়া দিবার উদ্দেশ্য! কর্তৃপক্ষের মতলবটা কি, কি তাঁহারা বলিতে চান? তবে কি—তবে কি যাহারা গাঁঠের কড়ি খরচা করিয়া নিয়মিত ভাবে এখানে সিনেমা দেখিতে আসে, সকলেই তাহারা একে একে শ্রীবিলাসের সামিল, আকছার সব রামভক্তের দল! কে জানে, কি এ ছবির উদ্দেশ্য! চুলোয় যাকগে, শ্রীবিলাস এখানে সিনেমা দেখিতে আসিয়াছে, সিনেমা দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইবে; এ সব লইয়া তার মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি!

ছায়াছবি ভাসিয়া উঠিল পর্দ্দার উপর। কবি চণ্ডীদাসের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে রচিত অপরূপ দৃশ্যকাব্য। শ্রীবিলাস মুগ্ধবিস্ময়ে অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল চণ্ডীদাসের অনুপম চরিত্র-রহস্য, রজকিনী রামীর একনিষ্ঠ উদ্দাম প্রেম। প্রাকৃতিক পটভূমিকায় দৃশ্যাবলীর মনোহারিত্বে, কুশলী শিল্পীর অভিনব অভিনয়-নৈপুণ্যে, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চণ্ডীদাসের জীবন-আলেখ্য যেন শতদল পদ্মের মত ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইয়া উঠিতে লাগিল শ্রীবিলাসের চোখের সামনে। শ্রীবিলাসের কাছে এ যেন এক গভীর রহস্য! কি সেই প্রেম—যার অলক্ষ্য ইঙ্গিত চণ্ডীদাসকে অপূর্ব্ব এক ভাবলোকের কবি করিয়া তুলিয়াছে। রজকিনী রামীর অন্তরলোকে সৃষ্টি করিয়াছে এক বিপ্লবের ঝটিকাবর্ত্ত। চণ্ডীদাসের প্রেমের বন্যায় মন প্রাণ, জাতিকুল, লাজভয়, সবকিছুই যে ভাসিয়া গেল রামমণির! রামী ও চণ্ডীদাসের অপরূপ প্রেম-কাহিনী বিহ্বল

করিয়া তুলিল শ্রীবিলাসকে। অতীন্দ্রিয় সে অমানুষী প্রেম—এ যে শ্রীবিলাসের কল্পনা ও ধ্যান ধারণার বাহিরে। তবু যেন মনে হয়, কি যে তার মনে হয়—নিজেই সে-কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে না শ্রীবিলাস। কি এ প্রেমের তাৎপর্য্য, কোথায় এর সার্থকতা!

দর্শকদের হৈ-হুল্লোড়ে শ্রীবিলাসের চমক ভাঙ্গিল। ছবি দেখানো শেষ হইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে উঠিয়া জনতার ভিড় ঠেলিয়া শ্রীবিলাস বাহিরে আসিয়া ফুটপাতের উপর দাঁড়াইল। এতক্ষণে যেন নিজেকে সে আবার খুঁজিয়া পাইতেছে। রাত্রের ট্রেনে দেশে ফিরিতে হইবে,—হাওড়ার ইষ্টেশন, টিকিট ঘরের সামনে সেই ঠেলাঠেলি আর গুঁতাগুঁতি, আবার সেই রেল গাড়ীর ঝামেলা।

ক্লান্ত পিসিকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবিলাস ট্রাম গাড়ীতে চাপিয়া বসিল।

গ্রামে ফিরিয়া শ্রীবিলাস শেষ পর্যন্ত এক থিয়েটার পার্টি খুলিয়া বসিল। পালা গাহিতে হইবে চণ্ডীদাস। কলিকাতা হইতে ফিরিবার কালীন একখানি চণ্ডীদাস নাটক সে খরিদ করিয়া আনিয়াছে। সেই নাটক খানিকেই কিছুটা ওলট পালট করিয়া যতখানা সম্ভব সিনেমার ছাঁচে ফেলিয়া আর একখানি নাটক লেখা হইয়াছে অভিনয়ের জন্য, নাট্যকার শ্রীবিলাস নিজে।

বাছাই বাছাই ছোকরাদের মধ্যে ভূমিকা-লিপি বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, চণ্ডীদাস সাজিবে শ্রীবিলাস স্বয়ং।

চণ্ডীদাস ছবিখানি শ্রীবিলাসের সত্যই খুব ভাল লাগিয়াছে। ছায়াচিত্রের শিল্পিগণকে আদর্শ করিয়া গ্রামের থিয়েটারে চণ্ডীদাস নাটকখানি পরিচালনা করিতে হইবে শ্রীবিলাসকে। কিন্তু একটা কথা,—কবি চণ্ডীদাস কি গলায় সোনার হার পরিত? সোনার হার, অর্থাৎ স্বর্ণাভরণ, সে যে নারীকণ্ঠের শোভা! চণ্ডীদাসের মত সাধক কবির পক্ষে কি—কিন্তু থাক্ সে তর্ক, ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই, শ্রীবিলাস একটা গাঁদা ফুলের মালা পরিয়াই কোন রকমে কাজ চালাইয়া লইবে। আর একটা কথা, অভিনয় কালীন আধুনিক কায়দায় অন্তর্বাস বা আণ্ডারওয়্যার পরিধান। চণ্ডীদাসের সময় এদেশের লোক আণ্ডারওয়্যার পরিতে অভ্যস্ত ছিল কি না, অথবা ল্যাঙট্ খেঁচিয়া স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষপাতী ছিল, কিম্বা আদৌ ও-সবের কোন প্রয়োজনই তাহারা বোধ করিত না, এত কাল পরে আজ সেকথা অনুমান করাও কঠিন। অপিচ পারিপাটী কেশবিন্যাস হয়ত কোন মতে চলিতে পারে, চাঁচর চিকুর বা দীর্ঘ কেশের বর্ণনা অনেক শোনা গিয়াছে; কিন্তু চণ্ডীদাসের আমলে বা তৎপূর্ব্বে এদেশে কাবলী ছাঁদে বব্-ছাঁটের প্রচলন হইয়াছিল কি না জোর করিয়া তাহা বলা যায় না। এ সব করিতে গেলে চণ্ডীদাসের রূপসজ্জা ও বেশবাসের দিক দিয়া অসঙ্গতির কোন কারণ ঘটিবে না ত! কিন্তু এত কথা ভাবিতে

গেলে অভিনয় করা চলে না। যুগের ধারা কিছুটা পাল্টাইয়াছে, এ কথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই; সুতরাং যুগধর্মের অনুরোধে চণ্ডীদাসকেও একটু ভোল পাল্টাইতে হইবে বৈ কি! চিন্তার কোন কারণ নাই, ওই ছায়াচিত্রের চণ্ডীদাসকে পুরাপুরি অনুসরণ করিলেই চলিবে। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। অভিনয়ে কি না চলে!

চণ্ডীদাস নাটকের মহলা চলিতেছে পুরাদমে। গ্রামের তরুণ সম্প্রদায় শ্রীবিলাসের অধিনায়কত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নাটক অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। বরোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপে আখড়া খোলা হইয়াছে। সন্ধ্যার পর চণ্ডীমণ্ডপ এখন সরগরম।

আখড়া হইতে অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া শ্রীবিলাস শয্যা গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু চোখে তার ঘুম নাই। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া একাগ্রচিত্তে চণ্ডীদাস ছবির কথাই সে ভাবিতে লাগিল। ছায়াচিত্রের চরিত্রগুলি রীতিমত নাড়া দিয়াছে শ্রীবিলাসের মনকে। বিশেষতঃ রামী ধোপানী তাহাকে পাগল করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। মরি মরি, রামীর কি রূপ! কালো কুচকুচে একপিঠ এলো চুলে রামীর সৌন্দর্য্য যেন বাড়িয়া গিয়াছে শতগুণ। কিন্তু রামী যদি আর একটুখানি রোগা হইত, তাহা হইলে হয়ত মানাইত আরও চমৎকার। কিন্তু রোগা হইলে তার শারীরিক দৈর্ঘ্যের অনুপাতে হয়ত তাকে একটু বেশি রকম লম্বা দেখাইত, হয়ত বা তার হাসি কান্না ও মান অভিমানের অবকাশে তার তুলতুলে গাল দুটিতে এমন সুন্দর দুটি টোল পড়িত

না। কিন্তু এত চমৎকার কীর্ত্তন গাহিতে শিখিল রামী কেমন করিয়া!

বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া রামী আর চণ্ডীদাসের কথাই ভাবিতে লাগিল শ্রীবিলাস! চোখে তার ঘুমের লেশ নাই, চণ্ডীদাসের রঙিন নেশা শ্রীবিলাসকে যেন মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। রামীর কথা ভাবিতে ভাবিতে পর্দ্দার রামী যেন মূর্ত্ত হইয়া শ্রীবিলাসের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, তার গানের সুর যেন গুন্ গুন্ করিয়া ভাসিয়া উঠে কানের কাছে।

বাঁধের ঘাটে কাপড় কাচিতে কাচিতে পর্দ্দার রামী যেন গান ধরিয়াছে, শ্রীবিলাস চোখ বুজিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। রামী গাহিতেছে :—

'বঁধু, কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে।'

শ্রীবিলাস মনে মনে নিজেকে চণ্ডীদাস কল্পনা করিয়া বাঁধের অপর পাড়ে ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতে বসিল। দূর হইতে চণ্ডীদাস হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে রামীর দিকে। রামী আপন মনে গান গাহিতে গাহিতে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া চণ্ডীদাসের দিকে এক একবার আড় চোখে চাহিতেছে, আর লজ্জায় মুখখানি তার রাঙা হইয়া উঠিতেছে। হঠাৎ দু'জনের চোখোচোখি হইতেই চণ্ডীদাসের দেহ মন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। হাতের হুইল-বাঁধা ছিপগাছটা বাগাইয়া ধরিয়া চণ্ডীদাস চড়াম করিয়া মারিল এক ঘাই। কিন্তু মাছ কই, এ যে কাঁকড়া, বঁড়শিতে

কাঁকড়া গাঁথিয়াছে। শ্রীবিলাস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কারণ রামী দেখিয়া ফেলিয়াছে যে চণ্ডীদাসের ছিপে মাছ লাগে নাই, লাগিয়াছে কাঁকড়া।

শ্রীবিলাসের কল্পনায় রামীর গান ক্রমশ শেষের দিকে আসিয়া পৌঁছিয়াছে:—

'আমি পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব রহিব কদম্বমূলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া বাঁশরী বাজাব যখন যাইবে জলে।
বাঁশরী শুনিয়া মোহিত হইয়া যতেক গোপের বালা'…

এবার কিন্তু চণ্ডীদাসের পালা, গানের শেষ চরণটি তাহাকেই গাহিতে হইবে। শ্রীবিলাস তন্ময়চিত্তে জোরসে হঠাৎ গলা ছাড়িয়া দিল,—'চণ্ডীদাস কহে তখন জানিবে পিরীতি কেমন জ্বালা'।

স্থান কাল পারিপার্শ্বিকের কথা ভুলিয়া গিয়াছে শ্রীবিলাস। পাশের ঘরে ক্ষান্তমণির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জোর গলায় সে একটা হাঁক দিয়া কহিল,—বিলেস, ও বিলেস, বলি এত রাত্রে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস কেন?

ক্ষান্তমণির সাড়া পাইয়া পাশের বাড়ীর বেঁড়ে কুকুরটা একবার ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। শ্রীবিলাসের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, রামীর ধ্যানে সে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। নিজে একবার চণ্ডীদাস সাজিয়া পাঁচখানা গ্রামের লোককে দেখাইয়া দিতে হইবে—অভিনয় কাহাকে বলে। সেই জন্যই ত শ্রীবিলাস আহার নিদ্রা ভুলিয়া থিয়েটার পার্টি সংগঠনকল্পে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। রঙ্গমঞ্চে চণ্ডীদাসের অভিনয় দেখিয়া দর্শকদের চোখে

পলক পড়িবে না। শ্রীবিলাস চণ্ডীদাস সাজিয়া গাহিবে,—'চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি পরাণ সহিত মোর'। রামী আসিয়া তার পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া কহিবে:—

'বঁধু, কি আর বলিব আমি,
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি।'

কিন্তু ছায়াচিত্রের রামীর পাশে গ্রামের থিয়েটার-পার্টির ব্যোমকেশ পরামানিকের খোঁচা খোঁচা দাড়ি সম্বলিত কর্কশ মুখখানা শ্রীবিলাসের মনে ভাসিয়া উঠিতেই অন্তর তার তিক্ততায় ভরিয়া গেল। আরে ছি ছি ছি—ওই নাপ্‌তে বেটাকে দিয়ে কি আর রামীর পার্ট চলে!

পাশের গ্রামের একটি ছোকরার সঙ্গে শ্রীবিলাসের আলাপ আছে। ছেলেবেলা হইতেই সে কৃষ্ণ-যাত্রার রাধিকা সাজিয়া আসিতেছে; চেহারাটি তার সুন্দর, গান গায় চমৎকার। তাহাকেই কোন রকমে ধরিয়া আনিয়া রামীর পার্টটি গছাইতে হইবে; ব্যোমকেশ পরামানিক বাতিল।

শ্রীবিলাস গুন্ গুন্ করিয়া আবার গান ধরিল:—

'কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥'

গাহিতে গাহিতে কখন্ সে হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উদ্ভট কল্পনা অবচেতন মনকে তার আচ্ছন্ন করিয়া অবাধে তখনো বিচরণ

করিতেছিল শ্রীবিলাসের মগজের মধ্যে, ঘুমাইতে আর দিল কই! তন্দ্রাঘোরে শ্রীবিলাস স্বপ্ন দেখিতে লাগিল :—

শ্রীবিলাস যেন চণ্ডীদাস সাজিয়া ছায়াচিত্রের পর্দ্দার উপর অভিনয় করিতেছে। চিত্রা সিনেমা হল লোকে লোকারণ্য। যে আসনে বসিয়া শ্রীবিলাস ছবি দেখিয়াছিল, সেই আসনে বসিয়া আছে পর্দ্দার আসল চণ্ডীদাস নিজে। চারিদিকে অসংখ্য চেনা মুখ, গাঁ ভাঙ্গিয়া শ্রীবিলাসের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনেরা ছবি দেখিতে আসিয়াছে। সমগ্র দর্শকমণ্ডলী অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে ছবির পর্দ্দার দিকে। শ্রীবিলাস হিরো, নায়ক-চরিত্রে সে অভিনয় করিতেছে; সুযোগ্যা নায়িকার সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীবিলাস যেন ক্রমশই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। পর্দ্দার রামী ধোপানী যখন সত্য সত্যই শ্রীবিলাসের পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া গান ধরিল—'তোমার চরণে আমার পরাণে বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি,'— শ্রীবিলাসের দেহ-মনে জাগিয়া উঠিল এক অপূর্ব্ব শিহরণ। রামী তাহাকে প্রেমের নিগড়ে বন্দী করিয়াছে, এ বাঁধন কি শ্রীবিলাস আর ইহ-জীবনে খুলিতে পারিবে!

শ্রীবিলাস হঠাৎ চাহিয়া দেখে দর্শকদের মধ্য হইতে পর্দ্দার আসল চণ্ডীদাস কটমট করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছে শ্রীবিলাসের দিকে, এক্ষুনি বুঝি তাড়া করিয়া আসিবে। কিন্তু কেন, শ্রীবিলাস কি সত্যই কোন অপরাধ করিয়াছে? ভয়ে শ্রীবিলাসের মুখ শুকাইয়া গেল, নাটকের সংলাপ সে ভুলিয়া গিয়াছে, রামীর কথার সে জবাব দিতে পারিল না। রামী হঠাৎ শ্রীবিলাসের

পা ছাড়িয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, গম্ভীরভাবে পিছন ফিরিয়া ঘোমটা দিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। রাগে, না অভিমানে, ঠিক বোঝা গেল না। শ্রীবিলাস বিস্ময়ে হতবাক। ছায়াচিত্রের আসল চণ্ডীদাস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পর্দ্দার উপর হইতে রামী তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। তাহাদের ভাবগতিক বেশ ভাল মনে হইল না শ্রীবিলাসের, দেখিয়া শুনিয়া শ্রীবিলাস যেন একটু ঘাবড়াইয়া গেল। হঠাৎ সে চাহিয়া দেখে, ছবির পর্দ্দা দূরে সরিয়া গিয়াছে, চণ্ডীদাসের অংশ অভিনয় করিতেছে পর্দ্দার আসল চণ্ডীদাস নিজে। শ্রীবিলাসের কানের কাছে ভাসিয়া আসিতে লাগিল :—

'আকাশে পাখী কহিছে গাহি,
মরণ নাহি মরণ নাহি'—

একি, এ যে চণ্ডীদাস পালার শেষ দিকের গান। রামীকে লইয়া চণ্ডীদাস দেশত্যাগ করিয়া যাইতেছে। ওই ত সেই বনপথ, খোলের বাদ্য শোনা যাইতেছে, চাঁদের আলোয় দিক দিগন্ত উদ্ভাসিত। কিন্তু এ দৃশ্যটিও ত শ্রীবিলাসেরই অভিনয় করিবার কথা ছিল। তবে তাহাকে সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে ডাকিয়া আনিয়া নকল চণ্ডীদাস সাজাইয়া এমন ধারা অপমান করা হইল কেন! এ নিশ্চয়ই আসল চণ্ডীদাসের ষড়যন্ত্র। কিন্তু রামীকে লইয়া সে ক্রমশই যে সরিয়া পড়িতেছে, একেবারে শ্রীবিলাসের চোখের উপর দিয়া; যেমন করিয়া হোক বাধা দিতে

হইবে। আস্তিন গুটাইয়া শ্রীবিলাস রঙ্গমঞ্চ হইতে মারিল একলাফ।

একি, মেইন সুইচ অফ্ করিল কে? ফিউজ্ড!

চারিদিক হঠাৎ অন্ধকার হইয়া গেল। সেই অন্ধকারের মধ্যে রাধী ও চণ্ডীদাসকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীবিলাস তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল,—লাইট! লাইট!

এমন সময় ক্ষান্ত পিসি আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিতেছে— বিলেস, ও বিলেস!

শ্রীবিলাস চোখ মিলিয়া চাহিল। সকাল হইয়া গিয়াছে। একি স্বপ্ন? মানসিক উত্তেজনায় রীতিমত ঘামিয়া উঠিয়াছে শ্রীবিলাস। শিয়রের জানালাটা হাত বাড়াইয়া খুলিয়া দিতেই সূর্য্যের সোনালী আলোয় সারা ঘর রাঙা হইয়া উঠিল। শ্রীবিলাসের মনের পর্দ্দায় ছায়াচিত্রের ছবিগুলি তখনো কিল্ বিল্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কানের কাছে পালা শেষের গান :—

'মরণ নীল সাগর হতে
জীবন বহে সুধার স্রোতে'—

শ্রীবিলাস শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া এক বাটি চা খাইয়া সে রওনা হইয়া গেল পাশের গ্রামের সেই কৃষ্ণযাত্রার ছোকরাটির খোঁজে। যেমন করিয়া হোক তাহাকে ধরিয়া আনিয়া রাধী সাজাইয়া থিয়েটারে নামাইতেই হইবে।

# গ্রামের কথা

গ্রামের লোক শ্রীবিলাসকে স্নেহ শ্রদ্ধা ও সম্মান করে যতখানি, ব্যক্তি বিশেষে কেহ কেহ আবার ভয়ও তাহাকে তার চেয়ে কিছু কম করে না। কারণ এ কথাটা গ্রামবাসীদের ভালরকমই জানা আছে যে কাহারো কোন অন্যায়কে সহজে সে বরদাস্ত করে না, শয়তানি খেলিয়া শ্রীবিলাসের সঙ্গে পার পাওয়া খুব কঠিন। ভালর সঙ্গে শ্রীবিলাস বেশ শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকটি, কিন্তু মন্দের সে যম। গ্রামের ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে শ্রীবিলাসের পরোয়া রাখে না, এমন লোক খুব কম। ভালও তারা বাসে তাকে যথেষ্ট। শুধু ও-পাড়ার ওই রাজকিশোর চক্রবর্ত্তী, মানে গ্রামেরই একজন বয়োবৃদ্ধ মাতব্বর, তারই সঙ্গে শ্রীবিলাসের বনিবনাটা কিছু কম। চক্রবর্ত্তী মশায় এই ডাংপিটে বেপরোয়া ছোকরাটির উপর বরাবরই একটু অপ্রসন্ন। কি যেন একটা তুচ্ছ ব্যক্তিগত কলহের ফলে মনোমালিন্যটা সম্প্রতি আর একটুখানি ঘনাইয়া উঠিয়াছে। ঠিক কথা বলিতে গেলে, উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমানে সম্বন্ধটা দাঁড়াইয়া গিয়াছে ঠিক যেন সাপে নেউলে। পথে-ঘাটে দৈবাৎ দু'জনের দেখা হইলে রাজু চক্রবর্ত্তী দূর হইতেই নাক সিটকাইয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই মহান অভিব্যক্তির পাল্টা জবাব স্বরূপ

শ্রীবিলাসও হয় গুন্ গুন্ করিয়া স্বরচিত একখানি চণ্ডীমাহাত্ম্যের পদ গাহিতে গাহিতে, কিম্বা স্থানীয় দুলেপাড়া নিবাসিনী শ্রীমতী কাদম্বরী দুলেনীর সহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মধুর সম্বন্ধ ঘটিত একটি নাতিদীর্ঘ ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে ধীরে ধীরে অপর দিক দিয়া প্রস্থান করে। রাজু চক্রবর্ত্তীর পিত্ত শুদ্ধ জ্বলিয়া যায়, মনে মনে বলিয়া উঠে,—হতভাগাটা মরেও না ত!

রাজু চক্রবর্ত্তী গাঁয়ের মাথা। তার সঙ্গে পথে ঘাটে বেয়াদপি করিতে সাহস করে কিনা বিলেস মুখুজ্যে! অসহ্য! যেমন করিয়া হোক তাহাকে জব্দ করিতে হইবে। বৈঠকখানায় বসিয়া রাজু চক্রবর্ত্তী লোক ডাকিয়া জটলা পাকায়, গ্রামের অন্যান্য মাতব্বরদের দলে টানিবার চেষ্টা করে। কিন্তু মুস্কিল হইতেছে এই যে, শ্রীবিলাসের অসাক্ষাতে রাজু চক্রবর্ত্তীর সামনে মুখে যে যাই বলুক, সামনা-সামনি কিন্তু সহজে তাহাকে ঘাঁটাইতে কেহ সাহস করিবে না,—এ এক রকম জানা কথা। তাই রাজু চক্রবর্ত্তী প্যাঁচ একটা কষিয়া রাখিয়াছে, একেবারে মোক্ষম; এ জালে বাছাধনকে পড়িতেই হইবে।

শ্রীবিলাসের পিতামহ তারণ মুখোপাধ্যায়ের বহু বিবাহের ফলে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর প্রায় অব্যবহিত পরই উক্ত বিবাহের কুৎসিৎ পরিণতির প্রসঙ্গ লইয়া এক সময় নাকি গ্রামের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। কালক্রমে সমস্তই আবার চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সে দিনের সেই অপ্রীতিকর স্মৃতি আজ আর কেহ মনে করিয়া রাখে নাই, কোন্ কালে সব ভুলিয়া গিয়াছে। রাজু

চক্রবর্ত্তী নিজেও এতকাল ও সব কথা ভুলিয়াই ছিল, কিন্তু সমাজের মুখ চাহিয়া সেই লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্ধার আজ নিতান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। স্বর্গীয় তারণ মুখোপাধ্যায়ের পরবর্ত্তী পারিবারিক ইতি-কথাকে অনুসরণ করিয়া এমন কতকগুলি মূল্যবান তথ্য রাজু চক্রবর্ত্তী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, যাহা সামাজিক শুচিতার দিক হইতে কোন মতেই উপেক্ষণীয় নয়। সমাজ-চাঁইদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ে একটা সামাজিক আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে হইবে, রাজু চক্রবর্ত্তীর পক্ষে মোটেই ইহা কঠিন হইবে না। শ্রীবিলাস যে ভদ্র সমাজে অচল, একথা সে প্রমাণ করিয়া দিবে। ইতিমধ্যেই কথাটা সে কয়েকজনের নিকট পাড়িয়া রাখিয়াছে, কিন্তু কাহারো কাছ হইতে আশানুরূপ সাড়া এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তা হোক, রাজু চক্রবর্ত্তী একসাই এক শ'। গ্রামের কয়েকটা লোককে হাত করিতে বড় বেশি তার সময় লাগিবে না,—রাজু চক্রবর্ত্তী গাঁয়ের মাথা। তা ছাড়া মহাজনী কারবারে গ্রামের মধ্যে রাজু চক্রবর্ত্তীর খাতক-সংখ্যাও বড় কম নহে। অসময়ে হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া থালা ঘটী বন্ধক রাখিয়া ধারকর্জ্জ করিবার জন্য অনেক বেটাকেই রাজু চক্রবর্ত্তীর দোরে আসিয়া ধন্না দিতে হয়। সে কি আর শ্রীবিলাসের মত একটা ইঁচড়পাকা বখাটে ছোকরাকে জব্দ করিতে পারিবে না! অবশ্যই পারিতে হইবে। রাজু চক্রবর্ত্তীর খপ্পরে পড়িয়া এ পর্য্যন্ত কত বেটা টিট হইয়া গিয়াছে। তাহার কাছে বিলেস মুখুজ্যে, সে ত একটা তিন দিনের বেঙাচি!

গুড়গুড়ির ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে রাজু চক্রবর্ত্তী মনে মনে ফন্দি আঁটিতে থাকে। কাদি ঝিকে কাছে ডাকিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করে,—আচ্ছা কাদু, আমাদের ক্ষান্তমণির স্বভাব চরিত্তির বেশ ভাল বলেই মনে হয় তোর, না? ভিতরে কোন গোলমাল নাই ত?

ক্ষান্তমণি শ্রীবিলাসের বিধবা পিসি।

কাদি ঝি মুখ বাঁকাইয়া জবাব দেয়,—বুড়ো বয়েসে তোমার ভীমরথী ধরেছে, না কি ঠাকুর? কাকে কি বলছো?

আযৌবন ব্রহ্মচারিণী বাল-বিধবা ক্ষান্তমণিকে গ্রামের লোক ভাল করিয়াই চিনে। কিন্তু চিনিলে কি হইবে, অহেতুক ছিদ্রান্বেষী লোক যাহারা, পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়াই সারা জীবন তাহাদের বাঁচিয়া থাকিতে হয়।

গ্রামের থিয়েটারে চণ্ডীদাস নাটক অভিনীত হইবে। নাটকের মহলা চলিতেছে বিপুল উৎসাহে। পাশের গ্রাম হইতে কৃষ্ণযাত্রার এক রাধিকাকে ধরিয়া আনিয়া রামীর পার্টে বাহাল করা হইয়াছে। ফুটফুটে সুন্দর চেহারাখানি, শ্রীবিলাসের সঙ্গে তাহাকে মানাইবে খুব চমৎকার, পল্লীগ্রামে এরূপ মণিকাঞ্চন সংযোগ খুব কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে।

ছায়াচিত্রের চণ্ডীদাসকে আদর্শ করিয়া গ্রামের থিয়েটারে চণ্ডীদাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে

লাগিল শ্রীবিলাস, যেমন করিয়া হোক চণ্ডীদাস তাহাকে সাজিতেই হইবে। ছায়াচিত্রের চণ্ডীদাসের সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া মনে মনে সে ব্যথিত হয়, পর্দার রামী ধোপানীকে মনে পড়িলে শ্রীবিলাসের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়। কি যে হঠাৎ হইল শ্রীবিলাসের, নিজেই সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

শ্রীবিলাস ছেলেবেলা হইতেই গীতবাদ্যের অনুরাগী। গান গাহিয়া আড্ডা মারিয়াই তার দিন কাটিয়া আসিতেছে। উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায় অতিরিক্ত সময় ব্যয় নিষ্প্রয়োজন বোধে ইচ্ছা করিয়াই একটু সকাল সকাল সে বিদ্যালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে এবং তদবধি কতকগুলি বৈষ্ণব পদ ও খোল খঞ্জনী সম্বল করিয়াই জীবনের এতগুলি বৎসর পরমানন্দে কাটাইয়া দিয়াছে। এই ভাবেই যদি বাকি জীবনটা কোন রকমে কাটিয়া যায়, মন্দ কি! এর অধিক কিছু আশা রাখে না শ্রীবিলাস।

শ্রীবিলাসের এই বাউণ্ডুলে ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া ক্ষান্তমণি মাঝে মাঝে হতাশ হইয়া পড়ে। অথচ একেবারে হাল ছাড়িয়াও দেওয়া যায় না, শ্রীবিলাসকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার সকল দায়িত্ব যে ক্ষান্তমণির উপর। সংসারের খোঁটায় যে পর্য্যন্ত না তার ভবঘুরে মনটাকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত কোনমতেই স্বস্তি পাইতেছে না ক্ষান্তমণি। তাই সে এবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে, যেমন করিয়া হোক শ্রীবিলাসকে সংসারী করিতে হইবে। শ্রীবিলাসের পাগলামি সে অনেক বরদাস্ত করিয়াছে, কিন্তু আর না, তার মতিগতির পরিবর্ত্তন

ঘটাইতে না পারিলে ঘর সংসার যে একেবারে ভাসিয়া যাইবে। ক্ষান্তমণি বকিয়া ঝকিয়া একশা করে শ্রীবিলাসের ওই বাউণ্ডুলে স্বভাবের জন্য, শ্রীবিলাস কিন্তু নির্ব্বিকার, ক্ষান্তমণির কোন কথাই সে গায়ে মাখে না। মুস্কিল ত ওইখানেই। শ্রীবিলাসের সঙ্গে ক্ষান্তমণির বাকবিতণ্ডা এক একদিন তুমুল হইয়া উঠে, শ্রীবিলাসেরই বিবাহের প্রসঙ্গ লইয়া। ক্ষান্তমণি ধমক দিয়া বলে,—বিয়ে তোকে করতেই হবে। শ্রীবিলাসের সেই এক কথা,—বিয়ে ক'রে খাওয়াব কি! শ্রীবিলাসের এই একগুঁয়েমির জন্য ক্ষান্তমণি ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, হয়ত বা সে মনে মনে একটু ব্যথাও পায়। কিন্তু উপায় কি! এ বিষয়ে শ্রীবিলাসের কোন হাত নাই, বিবাহ করা তার পক্ষে অসম্ভব। যেমন করিয়া হোক,—এ ফাঁড়া তাহাকে কাটাইতেই হইবে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গ্রামের ওই রাজকিশোর চক্রবর্ত্তীর মেজো মেয়ে হেমবরণীর সঙ্গেই শ্রীবিলাসের বিবাহের সম্বন্ধ প্রায় স্থির হইয়া গিয়াছিল, সে সময় তার মতামতের অপেক্ষা করা হয় নাই। পরে অবশ্য অজ্ঞাত কোন কারণবশতঃ ক্ষান্তমণি নিজেই সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেয়। অন্যত্র হেমবরণীর বিবাহ হইয়া যায় মাস কয়েকের মধ্যেই।

শ্রীবিলাস কিন্তু বাঁচিয়া গিয়াছে। ভাগ্যবতী রাজকিশোর-দুহিতা বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে সাত সাতটি সন্তানের জননী; মাঝে সে বার দুই যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছে। আণ্ডা বাচ্ছা কচি-কাচায় ঘর বার একেবারে গুল্‌জার। মা ষষ্ঠীর অপার

কক্ষণা বলিতে হইবে। শ্রীবিলাস কিন্তু রীতিমত ভয় করে, ইত্যাকার দায়িত্বের কথা চিন্তা করিয়া ওপথে আর পা বাড়াইতে সাহস তার হয় না। এই ভাবে মিছামিছি জীবনটাকে অশেষ প্রকারে বিড়ম্বিত করিয়া তুলিবার কোন অর্থই সে খুঁজিয়া পায় না।

শ্রীবিলাস মনে মনে ভাবে,—পাঁচ বৎসরে পাঁচ আর দুই সাতটা, কি সর্ব্বনাশ! হেমবরণীকে বিবাহ করিলে শ্রীবিলাসকে হয়ত আজ ভিটামাটি ছাড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া চিমটা হাতে পথে পথে বোম্ বোম্ করিয়া বেড়াইতে হইত। কাঃ তব কান্তা কস্তে পুত্র'! এ ঝামেলা কি মানুষের পোষায়! তার চেয়ে সে বেশ আছে, একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট। সৃষ্টি মোড়ল জমি চষিয়া দেয়, ক্ষান্ত পিসি রান্না করিয়া খাওয়ায়, সঙ্গী-সাথীরা দায় বিপদে মাথা দিয়া সুখ দুঃখের ভাগ বাঁটিয়া লয়; শ্রীবিলাস নিশ্চিন্ত। ব্যস্—আর চাই কি, এইটুকু বজায় থাকিলেই যথেষ্ট।

এতকাল শ্রীবিলাসের খোল কীর্ত্তনের দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি, সম্প্রতি থিয়েটারের নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে।

এই থিয়েটার বস্তুটির সঙ্গে গ্রামবাসিদের পরিচয়ের সুযোগ এ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। কবি গান, ঝুমুর নাচ, লেটো নাচ, কালীয় দমন, মায় সখের দলের যাত্রা পর্য্যন্ত তাহারা অনেক দেখিয়াছে, অনেক শুনিয়াছে; কিন্তু থিয়েটারের অভিনয়

দেখিবার সৌভাগ্য তাহাদের এ পর্য্যন্ত হয় নাই। অভিনয় একটা কিছু প্রত্যক্ষ করিবার আশায় সাগ্রহে তাহারা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। শ্রীবিলাস যখন এ কাজে হাত দিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সে নতুন রকমের একটা কিছু করিবেই,—এ বিশ্বাস গ্রামবাসীদের সকলেরই আছে।

থিয়েটার পার্টির আড্ডায় পুরাদমে মহলা চলিতেছে। আখড়া-ঘরে লোক আর ধরে না। গ্রামের অল্পবয়স্ক ছেলেছোকরা হইতে আরম্ভ করিয়া অতি উৎসাহী কয়েকজন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ ব্যক্তি পর্য্যন্ত সন্ধ্যার পর নিয়মিত ভাবে আখড়া-ঘরে গিয়া হাজির হয়। থিয়েটার ত তাহারা যথাসময়ে দেখিবেই, কিন্তু তৎপূর্ব্বে থিয়েটারের মহলা দেখাও তাদের পক্ষে কম লোভনীয় নয়। সন্ধ্যার দিকে পাঁচজনের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করিয়া সময় কাটে একরকম মন্দ না, চণ্ডীদাস নাটকখানিও ভাল, শুনিতে বেশ ভালই লাগে।

কণ্ঠিধারী রাখাল মালাকার আখড়ার মোহান্ত প্রভুর শিষ্য। নিজেও সে এক জন পরম ভাগবৎ ব্যক্তি। পৈতৃক ব্যবসা ছিল তার প্রতিমার সাজ-নির্ম্মাণ। সুদক্ষ শিল্পী বলিয়া রাখাল মালাকারের নাম ডাক ছিলো এক সময় যথেষ্ট। পার্শ্ববর্ত্তী দু'পাঁচখানা গ্রাম বন্ধনী ছিলো রাখালের। পূজা পার্ব্বনে তার ডাক পড়িত, রাখাল গিয়া নিজের হাতে প্রতিমা সাজাইয়া আসিত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া। শিল্পকর্ম্মে হাত খুব ভাল ছিলো রাখালের, তার হাতের ডাক-সাজ ছিলো ডাক সাইটে, সে জিনিসের

জৌলুসই ছিলো আলাদা। রাখালের ছেলেটাও হইয়াছিল ঠিক বাপের মতই, মালীর কাজে হাত ছিলো তার পাকা। জোয়ান বয়সে ছেলেটা হঠাৎ মারা যাওয়ার পর মনের তিতিক্ষায় শেষ পর্য্যন্ত কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দেয় রাখাল, জাতব্যবসা সে একেবারে ভুলিয়া দিয়াছে কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই। তাছাড়া দৃষ্টিশক্তিও দেখিতে দেখিতে কমিয়া গেল রাখালের, এ বয়সে মালীর কাজ করা রাখালের পক্ষে আর সম্ভবও নয়। জীবনের বাকি কয়েকটা দিন কষ্টেসৃষ্টে কোনরকমে এই ভাবে কাটিয়া গেলেই যথেষ্ট, এই টুকুই সে ঈশ্বরের পরম অনুগ্রহ বলিয়া মনে করে; এর বেশি কিছু আকাঙ্ক্ষা নাই রাখালের। রাখাল মালাকার লোকটি বড় ভাল, ঈশ্বরে তার অগাধ বিশ্বাস। তিন সন্ধ্যা হরিনাম আর গুরুমন্ত্র সম্বল করিয়াই পরমানন্দে দিন কটিয়া যায় রাখালের। কাহারো কোন সাতে-পাঁচে সে থাকে না।

হরিনামের থলি হাতে মালা জপিতে জপিতে সন্ধ্যার সময় নিয়মিত ভাবে থিয়েটার পার্টির আখড়ায় গিয়া হাজির হয় রাখাল। চণ্ডীদাস ও রামমণির কীর্ত্তনাঙ্গ পদগুলি শুনিতে শুনিতে রাখাল যেন বিভোর হইয়া যায়।

ঝানু বৈষ্ণব শ্রীদাম বৈরাগী থিয়েটার পার্টির বায়েন, পালাগানে সে খোল বাজাইয়া সঙ্গত করে এবং বাদ বাকি সময়টুকু রাখালের সঙ্গে গল্প করিয়া তামাক খাইয়া কাটাইয়া দেয়। হুঁকা টানিতে টানিতে শ্রীদাম বৈরাগী জিজ্ঞাসা করে,—কি রাখাল, গাওনা কেমন লাগছে?

হরিনামের থলিটি কপালে ঠেকাইয়া রাখাল মালাকার জবাব দেয়,—উৎকৃষ্ট—অতি উৎকৃষ্ট, এমন রস কি আর আছে ছিদেম !

শ্রীদাম বৈরাগী ব্যাখ্যা করিয়া বলে,—কানু ছাড়া গীত নাই, বুঝলে রাখাল ! তা আমাদের বিলেস ঠাকুর ব্রজের কানুই বটে, থিয়েটারের পালাটি যা ধরেছে, একেবারে এক নম্বর। বিলেসের গলায় কীর্ত্তন বেশ খোলে ভাল, কি বল রাখাল ?

রাখাল মালাকার ঘাড় নাড়িয়া জবাব দেয়,—গুরু কেমন, আসল গোড়া যে সেইখানে। জগৎ ঠাকুর ছিলেন এ অঞ্চলের ডাকসাইটে মূল-গায়েন, রাগসিদ্ধ মহাপুরুষ। তেনার শিক্ষের গুণ থাবেক কুথা বাবা ! নৈলে যে নাম ডুবে যায়।

রাখাল মালাকার মিথ্যা বলে নাই। শ্রীবিলাস গুন্ গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিয়া তার আদিগুরু স্বনামধন্য কীর্ত্তনীয়া খুল্লতাত জগৎ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত পদগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে হামেশাই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে ; নাম তাঁর এ পর্য্যন্ত ডুবিতে দেয় নাই।

অভিনয় শিক্ষাদান প্রসঙ্গে শ্রীবিলাস ছায়াচিত্রের চরিত্রগুলিকে স্মরণ করিয়া বিভিন্ন ভূমিকার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করে। সমবেত শিষ্যমণ্ডলী হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে শ্রীবিলাসের মুখের দিকে। শ্রীবিলাস তাহাদের পরিচালক, সঙ্গীত শিক্ষক ও নটগুরু নাট্যাচার্য্য, একাধারে অনেক কিছুই।

অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত মহলা চলিতে থাকে। শ্রীবিলাস দৃশ্যের পর দৃশ্য নাটকের পাতা উল্টাইয়া যায়।

মহলা দেওয়া শেষ হইলে নাট্যামোদী ছোকরার দল পরমানন্দে সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে, কেহ কেহ বা বক্তৃতা আওড়াইতে আওড়াইতে একে একে আখড়া-ঘর হইতে প্রস্থান করে। শ্রীদাম বৈরাগী তুরীয়ানন্দ বাবাজীর মন্ত্রশিষ্য। গুরুনাম স্মরণ করিয়া এই ফাঁকে সে গাঁজার কলিকায় আগুন ধরাইয়া দেয়,—ব্যোম মহাদেব! শ্রীদাম বৈরাগী, রাখাল মালাকার ও আরও দুই এক জন অনুরাগী গ্রামবাসীর মধ্যে পালাপালি করিয়া ক্রমাগত বড় তামাকের কলিকা ঘুরিতে থাকে।

# পদ্মবাঁধে

শ্রীবিলাসের একটু মাছ ধরার নেশা ছিল। সেদিন ছিপ হাতে পদ্মবাঁধে মাছ ধরিতে গিয়া হঠাৎ সে এক কাণ্ড করিয়া বসিল।

পদ্মবাঁধ গ্রামের একপ্রান্তে। কয়েক ক্ষেত ধানের জমি, খানিকটা ফাঁকা ডাঙ্গা ও ছোট্ট একটা পলাশের বাগান মাঝখানে ব্যবধান। একমাত্র স্নানের সময় ছাড়া গ্রামবাসিদের পদ্মবাঁধে যাতায়াত খুব কম। বাঁধের কালো জলে অজস্র শ্বেতপদ্ম ফুটিয়া আছে, অপূর্ব্ব শারদ শোভায় সারা পুকুর ঝলমল করিতেছে। গ্রামবাসীদের ব্যবহার্য্য কয়েকটি মাত্র ঘাট ছাড়া বাঁধের প্রায় সমস্তটাই পদ্মপাতায় ঢাকা। পাহাড়ের চারিদিক রকমারি গাছপালায় ভরতি। তার মধ্যে করঞ্জা ও আঁকড় গাছের সংখ্যা কিছু বেশি, মাঝে মাঝে কয়েক চারা কৃষ্ণচূড়া ও কেলিকদম্বও আছে। বাঁধের সমগ্র পারিপার্শ্বিক জুড়িয়া বেশ একটা সবুজের সমারোহ। দৃশ্যটি মনোরম, নয়ন-মন-মুগ্ধকর। উত্তর পাহাড়ের এক কোণে কয়েক ঝাড় পাহাড়ী বাঁশ খানিকটা জায়গা জুড়িয়া ওদিকটাকে প্রায় জঙ্গল করিয়া তুলিয়াছে। তারই এক ফাঁকে বসিবার মত একটু ঠাঁই করিয়া লইয়া ছিপ ফেলিয়া শ্রীবিলাস মাছ ধরিতে বসিয়াছে। ঘাটটি তার নিজস্ব আবিস্কার, নিশ্চিন্তে

নিরিবিলি বসিয়া মৎস্য ধরিবার এমন উপযুক্ত স্থানটি আর পাওয়া যাইবে না।

শ্রীবিলাস খুব পাকা শিকারী। গান বাজনার নেশার মত এও তার একটা নেশা। ছোটবেলায় গ্রামের কয়েকটি পুকুর গড়ে'র 'হালি পোনা' একলাই সে অর্দ্ধেক প্রায় সাবাড় করিয়া দিত। এখন অবশ্য রুচি অনেকটা পাল্টাইয়া গিয়াছে, 'হালি পোনা' মারিতে আর শ্রীবিলাসের প্রবৃত্তি হয় না, বড়র দিকেই ঝোঁক এখন বেশি। বড়মাছের মুড়াঘণ্ট সরুচালের অন্নসহযোগে আহার-কালীন রসনার তৃপ্তি সাধনই শুধু করে না, বঁড়শিতে মাছ গাঁথিয়া খেলাইয়া তাকে ডাঙ্গায় তুলিতে কি যে এক অপূর্ব্ব আনন্দ, যার ছিপে কখনও মাছ লাগে নাই—সে জন এ-কথা বুঝিবে না।

দুই হাতে হুইলবাঁধা ছিপখানা বাগাইয়া ধরিয়া শ্রীবিলাস ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। একাগ্র দৃষ্টি তাব ময়ূরপাখার ফাতনার উপর নিবদ্ধ। ফাতনাটি ডুবিলেই শিকার ও শিকারীব মধ্যে পরিষ্কার একটা বোঝাপড়া হইয়া যায় আর কি। মাঝে মাঝে ফাতনাও ডুবিতে লাগিল এবং ছিপধারী শিকারীর পক্ষ হইতে যথারীতি প্রতিক্রিয়াও চলিতে লাগিল পুবাদমে। কিন্তু ঝাড়া দুই ঘণ্টা কাল বহু মেহনৎ বহু কসরৎ করিয়াও শ্রীবিলাস একটা মাছও ছিপে গাঁথিতে পারিল না, প্রত্যেকটি ঘাই তার ব্যর্থ হইয়া যায়। অবশেষে বহু গবেষণার পর অনেক কৌশল খাটাইয়া জল হইতে যাহা সে ঘাই মারিয়া ডাঙ্গায় তুলিল, তাহা মৎস্য বা মৎস্যজাতীয় কোন খাদ্য বস্তুই নয়; ছিপে লাগিয়া ডাঙ্গায় উঠিল

গোটা দুই তিন কাঠপোকা, কালো কুচকুচে ভ্রমরের মত চেহারা। ওই অপরূপ জীবগুলিই এতক্ষণ ধরিয়া ক্রমাগত ফাতনা ডুবাইতেছিল।

কাঠপোকার কাণ্ড দেখিয়া শ্রীবিলাস অবাক, হো হো করিয়া সে নিজের মনেই একবার হাসিয়া উঠিল। ফাতনা ডুবাইবার কি অপূর্ব্ব কৌশলই না আয়ত্ত করিয়াছে এই অতিবুদ্ধি জলচর জীবগুলি। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবিলাসের মনে পড়িয়া গেল চণ্ডীদাসের কথা। ঠিক এমনি করিয়া ছায়াচিত্রের চণ্ডীদাসের ছিপে মাছ না লাগিয়া কাঁকড়া লাগিয়াছিল। শ্রীবিলাসের কপালে কিন্তু কাঁকড়াও জুটিল না, ঘাটে আসিয়া ভিড় করিয়াছে কাঠপোকা; রুই কাতলা কি আর ঘাটে ভিড়িবে? আশা খুব কম।

শ্রীবিলাস আর একটা টোপ গাঁথিয়া ছিপ ফেলে। মন কিন্তু তার কোথায় যেন উধাও হইয়া গিয়াছে, শিকারে বেশ মন বসিতেছে না। বেলাও এদিকে অবসন্ন প্রায়। স্তিমিত সূর্য্যের সোনালী আভায় পৃথিবীর মুখে যেন প্রশান্ত একটা হাসির আমেজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রভাতের ঘরছাড়া পাখীগুলি দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের বুকে ডানা মেলিয়া দল বাঁধিয়া নীড়ে ফিরিতেছিল। দূরে মালঞ্চার পাহাড়ের চূড়ায় কয়েক খণ্ড লঘু মেঘ এক জায়গায় জমা হইয়া নীল আকাশের বুকে যেন রঙবাহারের পেখম তুলিয়া ধরিয়াছে। পদ্মবাঁধের অপর পাড়ে এক বকদম্পতী এক ঠ্যাংএ ভর দিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া।

শ্রীবিলাস অকস্মাৎ অনুভব করিল নিখিল বিশ্বের অন্তস্তল উপ্‌চাইয়া যেন কোন্ অনন্তের উদ্দেশে ধীর শান্ত মৃদুবেগে বহিয়া যাইতেছে কি যেন এক মর্ম্মোচ্ছ্বাসী অনুরাগের প্লাবন। আকাশে বাতাসে তারই যেন ঢেউ লাগিয়াছে। কেমন যেন একটা মদির স্বপ্ন শ্রীবিলাসের মনটাকে ধীরে ধীরে দোলা দিতে লাগিল।

শ্রীবিলাস তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরাইল, নিঃসঙ্গ মনটাকে তার একটুখানি চাঙ্গা করিয়া লইবার জন্য। কিন্তু বৃথা, সেই বিহ্বল ভাবটাকে কোন মতেই সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছে না। শ্রীবিলাস ধীরে ধীরে ছিপ গুটাইতে আরম্ভ করিল; আর নয়,—বাড়ী ফিরিতে হইবে।

বামাকণ্ঠের মৃদুগুঞ্জন আসিয়া শ্রীবিলাসের কানের কাছে যেন বাজিয়া উঠিল। নিকটেই কোথায় কে যেন করুণ সুরে গান ধরিয়াছে :—

'বঁধু কি আর বলিব তোরে'।

অপরিচিত কণ্ঠস্বর, অনভ্যস্ত বামাকণ্ঠ, গলাখানি কিন্তু চমৎকার।

উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল শ্রীবিলাস: নিজের অজ্ঞাতেই সে হঠাৎ যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। আশ্বিনের ভরা সন্ধ্যায় নির্জ্জন এই পদ্মবাঁধের তীরে আসিয়া হঠাৎ কে আজ এমন ভাবে সঙ্গীত সাধনা সুরু করিয়া দিল :—

'বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে।'

সে কি, কোন্ নিষ্ঠুর বঁধু তার প্রণয়-বিধুরা অল্পবয়স্কা প্রিয়াকে অসময়ে গৃহছাড়া করিয়াছে ? রহিতে না দিলি ঘরে !—

গান চলিতে লাগিল। বিরহিনী অভিমানে সাগরের জলে ডুবিয়া মরিবে। শুধু মরিয়াই সে ক্ষান্ত হইবে না, পরজন্মে তার নিষ্ঠুর দয়িতকে 'রাধা' করিয়া নিজে সে এবার নন্দ-নন্দন কানু হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। মরণের তীরে দাঁড়াইয়া বিরহিনী রাধার একি অপরূপ আকুতি, একি তার মৃত্যুঞ্জয়ী কামনা,— 'মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা।'

তা না হয় হইল, কিন্তু পদটি কে গাহিতেছে একবার দেখা দরকার। দুর্ভেদ্য বাঁশবনের অন্তরাল ভেদ করিয়া ওদিকটায় কিছু দেখা যায় না। শ্রীবিলাস তাড়াতাড়ি ছিপ গুটাইয়া একটু ফাঁকার দিকে আসিয়া দাঁড়াইতেই তার চোখে পড়িল—গাঁয়ের মেয়ে লক্ষ্মী মালিনী সান-বাঁধানো সদর ঘাটের পৈঠার উপর বসিয়া ধুচুনি করিয়া চাল ধুইতেছে, আর নিজের মনেই মশ্‌গুল হইয়া গুন্ গুন্ করিয়া মিঠে গলায় গান ধরিয়াছে,—'বঁধু কি আর বলিব তোরে।'

লক্ষ্মী মালিনী রাখাল মালাকারের বিধবা কন্যা। বয়স তার সতের কি আঠারোর বেশি নয়। নিটোল স্বাস্থ্য, দেখিতে বেশ সুশ্রী, গায়ের রঙ খুব ফর্সা না হইলেও একেবারে শ্যামাঙ্গীও তাকে বলা যায় না। বয়সের বান তার সারা অঙ্গের কানায় কানায় ছাপিয়া উঠিয়াছে।

বছর দশেক বয়সের সময় বিধবা হইয়া লক্ষ্মী আর বুড়া বাপকে ফেলিয়া শ্বশুরবাড়ী যায় নাই, বরাবর সে বাপের বাড়ীতেই

রহিয়া গিয়াছে। অভাবের সংসার, সামান্ত কয়েক বিঘা ধেনো জমির আয় মাত্র সম্বল রাখালের, সম্বৎসরের খরচা তাহাতে কুলায় না। লক্ষ্মীরা পিসি-ভাইঝিতে গ্রামের লোকের ধান ভানিয়া আর মুড়ি ভাজিয়া সংসার খরচার ঘাটতিটা কষ্টেস্থষ্টে কোন রকমে পূরণ করিয়া দেয়; সে জন্ম আর ভাবিতে হয় না রাখালকে। সংসারের সকল ভার লক্ষ্মীর উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে রাখাল।

নির্জ্জন পুকুর ঘাটে লক্ষ্মী মালিনীকে এইভাবে গান গাহিতে দেখিয়া শ্রীবিলাস অবাক হইয়া গেল। লক্ষ্মীও গান গায়, একথা ত জানা ছিল না শ্রীবিলাসের! কিন্তু এ গান সে শিখিল কোথায়!

শ্রীবিলাস হয়ত খোঁজ রাখিত না,—গ্রামের থিয়েটার পার্টির অনুগ্রহে চণ্ডীদাস পালার গানগুলি ইতিমধ্যেই পথে ঘাটে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এই লক্ষ্মীকে ছেলেবেলা হইতেই দেখিয়া আসিতেছে শ্রীবিলাস। কিন্তু তার মধ্যে যে এত ভাব—এত মাধুর্য্য—এত উচ্ছ্বাস অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত নিঃশব্দে সঞ্চারিত হইয়া আছে, তাহা সে কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ শুধু একদৃষ্টে দূর হইতে সে চাহিয়া রহিল লক্ষ্মীর মুখের দিকে। কি যেন এক অনাস্বাদিত অভিনব ভাবের তরঙ্গলহরী খেলিয়া গেল তার স্বপ্নাতুর চিত্তের তটপ্রান্তে। কে এ? এই কি সেই লক্ষ্মী মালিনী, রাখাল মালাকারের বিধবা কন্যা? না, এই সেই

চণ্ডীদাসের রজকিনী রামী, বহুকাল পরে নান্নুরের ধোপা পুকুর ভ্রমে পদ্মবাঁধে আজ চাল ধুইতে আসিয়াছে!

লক্ষ্মী ও রামী শ্রীবিলাসের চোখে যেন একাকার হইয়া গেল। চণ্ডীদাসের বিহ্বল দৃষ্টি লইয়া শ্রীবিলাস যেন লক্ষ্মীকে গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। গানের স্বরে দিক ভুলিয়া ধীরে ধীরে কখন যে সে সদর ঘাটের পৈঠায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, নিজেই সে এতক্ষণ টের পায় নাই। শ্রীবিলাসের পায়ের শব্দে লক্ষ্মী হঠাৎ গান ছাড়িয়া চমকিয়া উঠিল। পিছন ফিরিয়া দেখে ছিপ হাতে করিয়া শ্রীবিলাস তার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

লজ্জায় ও সঙ্কোচে লক্ষ্মী যেন এতটুকু হইয়া গেল। হাতের কাজ তার বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীবিলাস ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—থামলি যে, গেয়ে যা।

লক্ষ্মীর মুখচোখ লাল হইয়া উঠিল। শ্রীবিলাসের কথার যে কি জবাব দিবে হঠাৎ সে কিছু ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না।

শ্রীবিলাস পুনরায় কহিল,—তুই যে এত চমৎকার গাইতে পারিস লক্ষ্মী, এ আমার জানা ছিলো না। শেষ পর্য্যন্ত গেয়ে যা, আমি শুনবো।

শ্রীবিলাসের এ বাড়াবাড়ি লক্ষ্মীর আর সহ্য হইল না। মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তীব্রকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল,—বিলেস ঠাকুর!

শ্রীবিলাস হাসিয়া কহিল,—কি!

—কেন তুমি চোরের মত এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছ?

—তোকে দেখতে, তুই যে এত সুন্দর—তা কোনদিন দেখিনি।

লক্ষ্মী দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল সে,—বিলেস্ ঠাকুর, আমাদের কি মনে কর তুমি! গরীব মানুষ বলে' কি পথে ঘাটে তোমরা এইভাবে আমাদের অপমান করবে মনে করেছ!

রাগে ও দুঃখে লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, ঝর ঝর করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

শ্রীবিলাস হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় লক্ষ্মীর ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—একি, একেবারে কেঁদে ফেললি যে! আমাকে তুই বিশ্বাস কর লক্ষ্মী, তোর কোন ক্ষতি করবার মতলবে—

কি স্পর্দ্ধা এই বিলেস মুখুজ্যের! লক্ষ্মীর অঙ্গ স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে সে এতটুকু দ্বিধা করিল না,—কি আশ্চর্য্য!

শ্রীবিলাসের স্পর্শে লক্ষ্মীর বুকের রক্ত যেন নাচিতেছিল। ক্ষিপ্রবেগে হাত ছাড়াইয়া লইয়া তীব্রকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল,—কি তুমি বলতে চাও বিলেস ঠাকুর, এতটুকু লজ্জাও করে না! ভাল চাও ত আমার সামনে থেকে সরে যাও তুমি।

শ্রীবিলাস চকিতে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মীর কথায় এতক্ষণে যেন সে সম্বিত ফিরিয়া পাইতেছে। সত্যই ত, কি ভয়ানক অন্যায় করিতেছে সে! কেমন করিয়া ভুলিয়া গেল শ্রীবিলাস যে পথে ঘাটে এমন করিয়া অনাত্মীয়া পরনারীর সঙ্গে

গায়ে পড়িয়া আলাপ করা চলে না; শ্রীবিলাসের এ আচরণ যে কতখানি অশোভন, এতক্ষণ সে ভাবিতেও পারে নাই। কি যে হঠাৎ মতিচ্ছন্ন হইল শ্রীবিলাসের!

মুহূর্তে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া শ্রীবিলাসের মাথাটা যেন আপনা হইতেই নীচু হইয়া গেল। কি যে তাহাকে ভাবিল লক্ষ্মী! কে জানিত যে পদ্মবাঁধে মাছ ধরিতে আসিয়া হঠাৎ সে আজ এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে!

লক্ষ্মী মালিনীর পিসি গিরি মালিনী আর এক ধুচুনি চাল লইয়া ধুইবার জন্য ঘাটে আসিতেছিল। লক্ষ্মী ও শ্রীবিলাসের বিসদৃশ ব্যাপারটা দূর হইতে তার চোখে পড়িয়াছে। দুমদাম শব্দে ঘাটে নামিয়া গিরিবালা তাড়াতাড়ি চাল ধুইয়া লইল। লক্ষ্মীর ধুচুনিটা জোর করিয়া তার হাতে গুঁজিয়া দিয়া গিরিবালা লক্ষ্মীকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল,—চল্ এবার ঘরে চল্, কালামুখার মরণ হয় না!

লক্ষ্মী ভয়ে কাঠ হইয়া গিয়াছে। শ্রীবিলাস অপরাধীর মত মাথা নীচু করিয়া গিরিবালার দিকে একটু আগাইয়া গিয়া কহিল, —ওর কোন দোষ নাই গিরি, দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে—সে আমার।

গিরি মালিনী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল,—তুমি আর কথা কয়ো না ঠাকুর, তুমি যত ভদ্দর তা বোঝা গেছে।

গিরিবালার মুখের দিকে চাহিয়া শ্রীবিলাস স্তব্ধ হইয়া গেল।

লক্ষ্মীর উদ্দেশে গিরিবালা আবার বলিয়া উঠিল,—চল্ হতভাগী, ভালোয় ভালোয় আগে ঘরে ফিরে চল্,—তারপর মজা টের পাবি।

লক্ষ্মী এক জায়গায় দাঁড়াইয়া ঠুক্ ঠুক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। সর্ব্বাঙ্গে যেন তার খিল ধরিয়া গিয়াছে। গিরিবালা লক্ষ্মীকে একটা ঠেলা দিয়া তার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে পথে গিয়া নামিল।

সন্ধ্যার কালোছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। শ্রীবিলাস পদ্মবাঁধের পাড়ে দাঁড়াইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। পদ্ম ফুলের পাপড়িগুলি তখন বুজিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ পা'ড়ের একঠেঙ্গা বক দুইটাকেও আর দেখা যায় না।

কয়েকদিন পরের কথা। শ্রীবিলাস থিয়েটারের আখড়া হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, রাত তখন অনেক। পথঘাট নিঝুম হইয়া গিয়াছে, হিঙ্গুল নদীর বাঁকে কৃষ্ণাষ্টমীর চাঁদ উঠিতেছিল। শ্রীবিলাস গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিয়াছে :—

'কত ঘর বাহির করিব দিবা রাত্তি।
বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি'।

মালীপাড়ার মোড়ে আসিয়া শ্রীবিলাস হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। পিছন দিক হইতে চাপা গলায় কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে, —বিলেস ঠাকুর!

শ্রীবিলাস একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে লক্ষ্মী মালিনী আসিয়া দাঁড়াইল তার সামনে।

শ্রীবিলাস আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এত রাত্রে লক্ষী হঠাৎ কি মনে করিয়া!

শ্রীবিলাস কথা কহিবার পূর্ব্বেই লক্ষী আসিয়া তার পা দু'টি হঠাৎ জড়াইয়া ধরিল, রুদ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিল,—বিলেস ঠাকুর, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

শ্রীবিলাস তাড়াতাড়ি একটু সরিয়া দাঁড়াইল। শশব্যস্তে সে বলিয়া উঠিল,—কিসের ক্ষমা লক্ষী, কি হয়েছে—ব্যাপার কি বল্ ত!

লক্ষীর মুখ দিয়া কথা সরিতেছে না, কান্নায় তার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। ভাঙ্গা গলায় কোন রকমে সে জবাব দিল,—তোমাকে আমি ছোট কথা বলেছি ঠাকুর, তুমি কিছু মনে করো না।

পদ্মবাঁধের ঢেউ আসিয়া মুহূর্ত্তে যেন শ্রীবিলাসের মনটাকে হঠাৎ প্লাবিত করিয়া দিয়া গেল। শ্রীবিলাস একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তোর ত কোন দোষ নাই লক্ষী, আমিই সেদিন না বুঝে তোর অপমান ক'রে বসেছিলাম। সে কথা আজো ভুলতে পারিস নি বুঝি?

লক্ষী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠে,—সে কথা কেন ভাবছো তুমি বিলেস ঠাকুর, অপমানের কথা তুলে আমাকে তুমি ছোট ক'রে দিয়ো না; তুমি যে আমার চেয়ে কত উঁচু, আমি তোমার পা ছোঁয়ারও যুগ্যি নই। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই আমি চেপে রাখতে পারছি না।

বলিতে বলিতে ক্ষণেকের জন্য লক্ষী হঠাৎ থামিয়া গেল। শ্রীবিলাস অবাক বিস্ময়ে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে লক্ষীর মুখের দিকে। সকল সঙ্কোচ মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া লক্ষী আবার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—সেদিন থেকে নিজের মনকে যে আমি কোন মতেই বাঁধতে পারছি না, ঠাকুর! থেকে থেকে শুধু তোমার কথাই মনে পড়ে। কেন এমন হয় বলতে পার?

শ্রীবিলাসের মনের মধ্যেও অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল ঠিক একই প্রশ্ন,—কেন এমন হয়? কেন এমন হয়! শ্রীবিলাস যেন অনুভব করিতে লাগিল তার বুকের কাছে উষ্ণ একটি কোমল হিয়ার স্পন্দন। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে বলিয়া উঠিল,—আমিও—আমিও বুঝি নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে; যেদিন থেকে তোর গান শুনেছি, সেদিন থেকে তোর মুখখানি যেন অহরহ আমার চোখের সামনে ভাসছে। ভুলতে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কই—পারছিনা ত!

দৃপ্তকণ্ঠে লক্ষী হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ ঠাকুর! আমার মনে আগুন জেলে দিয়ে ভুলে তোমায় থাকতে দেবে কে!

শ্রীবিলাস একটু বিস্মিত কণ্ঠে কহিল,—কিন্তু—সে কথা আর কেন, এ তুই কি বলছিস লক্ষী!

লক্ষী ধীরকণ্ঠে জবাব দিল,—ভয় নাই, লক্ষী মালিনী কোন দিন তোমার পাশ মাড়াবে না। তোমার গায়ে কলঙ্কের কালি,

সে কি আমি লেপে দিতে পারি! তুমি শুধু দূর থেকে আমার প্রণাম নিয়ো ঠাকুর, এইটুকু শুধু বলা রইলো।

শ্রীবিলাসের বাকশক্তি বুঝি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, পাথরের মূর্ত্তির মত সে নিশ্চল। লক্ষীর কোন কথার জবাব দিবার মত ভাষা যেন সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। বিহ্বল দৃষ্টিতে লক্ষীর মুখের দিকে চাহিয়া লক্ষীকে যেন সে নিবিড়ভাবে অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

লক্ষী পুনরায় বলিয়া উঠিল,—আর একটু দাঁড়াও, যাবার আগে তোমাকে একটা প্রণাম ক'রে নি'।

লক্ষী গড় হইয়া শ্রীবিলাসের পায়ের ধূলা মাথায় লইল। আমবাগানের ফাঁকে তখন চাঁদ হাসিতেছে।

---



শ্রীকালীপদ ঘটক

# পাকা দেখা

ক্ষান্তমণি বহুদিন হইতেই শ্রীবিলাসের জন্য একটি পাত্রী খুঁজিতেছিল। প্রতিবেশী রাইজী মহাশয়ের চেষ্টায় মনোমত সৎপাত্রী একটি জুটিয়া গিয়াছে। দু'তিন জায়গায় পাত্রী দেখার পর কুলেকুঁড়ির গোবর্দ্ধন সিকদারের চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী পারুল বালাকে রাইজী মহাশয় দেখিয়া শুনিয়া পছন্দ করিয়া আসিয়াছেন। দিব্যি চমৎকার মেয়ে, বছর ষোল প্রায় বয়স হইয়াছে, নিটোল স্বাস্থ্য, সাংসারিক কাজকর্ম্মে একেবারে পাকা। গ্রামের পণ্ডিত মশায়ের পাঠশালায় লেখাপড়াও সে কিছু শিখিয়াছে, সুর করিয়া রামায়ণ মহাভারত পর্য্যন্ত পড়িতে পারে। ক্ষান্তমণির ভারি পছন্দ, এ মেয়েটি যদি হয়—কোন দিক দিয়াই মন্দ হইবে না। রাইজী একরূপ কথা দিয়া আসিয়াছেন। কন্যাকর্ত্তা পাত্র দেখিয়া বিবাহের দিন-ক্ষণ একেবারে স্থির করিয়া যাইবেন।

এই প্রসঙ্গ লইয়া ক্ষান্তপিসির সঙ্গে শ্রীবিলাসের কয়েক দিন হইতেই বাকবিতণ্ডা চলিতেছিল। কিন্তু শ্রীবিলাসের কথা শোনে কে? শ্রীবিলাস বিবাহ করিতে নারাজ, ক্ষান্তমণি কিন্তু তাহাকে বিবাহ না করাইয়া কোনমতেই ছাড়িবে না; শ্রীবিলাসের কোন আপত্তি, কোন যুক্তিই সে মানিয়া লইতে রাজী নয়। বাপ-পিতামোর বংশটা ত রক্ষা করিতে হইবে।

শ্রীবিলাস বলে,—হেই পিসি, পায়ে পড়ি তোর, বিয়ে আমি কিছুতেই করবো না। ক্ষান্তমণি ধমক দিয়া বলে,—বিয়ে করবি কি তুই, বিয়ে করবে তোর ঘাড়; আলবাৎ বিয়ে করতে হবে।

শ্রীবিলাস বিবাহ না করিলেও তার ঘাড় যখন বিবাহ করিতে বাধ্য, তখন আর কি বলা যাইতে পারে। গ্রামের মেয়ে রাজকিশোর-দুহিতা হেমবরণী একবার শ্রীবিলাসের ঘাড়ে চড়িতে চড়িতে রহিয়া গিয়াছে, আবার কোন্ এক সিকদার-নন্দিনীর দুর্ল্ভ-পতিভাগ্য হঠাৎ সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল—বিধাতাই জানেন।

ক্ষান্তমণির সঙ্গে যুক্তিতর্কে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া শ্রীবিলাস নানান্ কথায় বিবাহের প্রসঙ্গটাকে কোন রকমে চাপা দিয়া ফাঁকতালে কখন সরিয়া পড়ে।

ক্ষান্তমণিকে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনমতেই নিরস্ত করিতে পারা গেল না। রাইজী ও সিকদার মহাশয়ের মধ্যে ঘন ঘন পত্র বিনিময় চলিতে লাগিল বিপুল উৎসাহে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে কুলেকুঁড়ির শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন সিকদার মহাশয় ছই-ঘেরা গো-শকট যোগে সাড়ে ছয় ক্রোশ পথ ভাঙ্গিয়া শ্রীবিলাসের বাটীতে আসিয়া পদার্পণ করিলেন। ক্ষান্তমণির পক্ষ হইতে যথাযোগ্য অভ্যর্থনার ত্রুটি হইল না, পূর্ব্ব হইতেই আয়োজনাদি প্রস্তুত ছিল।

আহারান্তে সিকদার মহাশয় চাল্‌শের চশমাখানা কানে জড়াইয়া রাইজী মহাশয়ের সহিত কোষ্ঠীবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রাশি-

নক্ষত্রাদি চমৎকার মিলিয়া গিয়াছে, কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই ; একেবারে রাজযোটক। বিধাতার নির্ব্বন্ধ যখন এতখানি অনুকুল, তখন আর ও সম্বন্ধে কথা কি ! সিকদার মহাশয় মনস্থির করিয়া ফেলিলেন, রাইজী মহাশয় তথা ক্ষান্তমণি দেবীও শুভকার্য্য সম্পাদন মানসে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। পাত্র আশীর্ব্বাদের আয়োজন চলিতে লাগিল ; শুভস্য শীঘ্রং—অনর্থক আর কালহরণে প্রয়োজন কি !

শ্রীবিলাসের পাকা দেখার সংবাদটা পাড়ায় ঘরে ইতিমধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রতিবেশিনিগণ একে একে আসিয়া জুটিতে লাগিল। বৈঠকখানা ঘরে রাইজী ও সিকদার মহাশয় বিবাহের প্রসঙ্গ লইয়া গল্পগুজবে মশ্‌গুল হইয়া উঠিয়াছেন। সিকদার মহাশয় মহা খুশী, রাইজী মহাশয় ততোধিক। অগ্রহায়নের সর্ব্বপ্রথম বিবাহের শুভদিনটিই প্রশস্ত, সিকদার মহাশয় ওই দিনই কায়েম রাখিলেন। এ পক্ষ হইতেও অসুবিধার কোন কারণ নাই, পাত্রপক্ষও সিকদার মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে এক মত ; যথাসত্বর চারি হাত এক হইয়া যাক, অপত্তি কি। রাইজী মহাশয় ঘন ঘন কলিকা পাল্টাইতে লাগিলেন, সিকদার মহাশয় পরম নিশ্চিন্তে তামাকু সেবনে ব্যাপৃত। মজলিসী আলোচনায় বৈঠকখানাঘর সরগরম হইয়া উঠিয়াছে।

ভিতর বাড়ীতে ক্ষান্তমণির সঙ্গে শ্রীবিলাসের বোঝাপড়া চলিতেছে পুরাদমে। শ্রীবিলাসের বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই। ক্ষান্তমণি তাহাকে নানান্ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করে, পিঠে তার

হাত বুলাইয়া মোলায়েম স্বরে বলিতে থাকে,—দোহাই নক্ষী বাবা আমার, বিয়ে না করলে ঘরসংসার চলবে কেমন ক'রে!

শ্রীবিলাস বিবাহ না করিলেও ঘরসংসার যে তার অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে, এ কথা সে বহুবার ক্ষান্তমণিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বৃথা। এখন এই কন্যাদায়গ্রস্ত আগন্তুক ভদ্রলোকের হাত হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় কি—ইহাই এখন শ্রীবিলাসের নিকট বড় প্রশ্ন।

ক্ষান্তমণি আশীর্ব্বাদের আয়োজন লইয়া ব্যস্ত। পাড়ার মেয়েরা আসিয়া গুলতানি পাকাইয়াছে। শ্রীবিলাস দূর হইতে পাশের বাড়ীর শ্রীমতী হরিদাসীকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। মাত্র কয়েকমাস পূর্ব্বে তার বিবাহ হইয়াছে। শ্রীবিলাসের এই বিবাহঘটিত শুভ অনুষ্ঠানে সকলের চেয়ে তারই যেন উৎসাহ ও উদ্দীপনাটা কিছু বেশি। মেয়েটি কিন্তু শ্রীবিলাসের খুব অনুগত; শ্রীবিলাস ইসারা করিয়া হরিদাসীকে কাছে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল,—লক্ষী দিদি আমার, তোকে একটা কথা বলবো?

হরিদাসী পরিষ্কার চাঁচাঁ গলায় বলিয়া উঠিল,—কি বলবে তাই বল না!

শ্রীবিলাস একটু চাপা গলায় বলিল,—চেঁচাস না—আস্তে, কি বলছিলাম জানিস,—বলি পিসিকে একটু বলে' কয়ে বিয়েটা আমার কোন রকমে ভাঙ্গিয়ে দিতে পারিস দিদি! দেখনা একবার চেষ্টা ক'রে।

শ্রীবিলাসের প্রস্তাব শুনিয়া হরিদাসী অবাক হইয়া গেল। ঈষৎ রাগত ভাবে সে বলিয়া উঠিল,—ধ্যাৎ—কি যে তুমি বলছো!

শ্রীবিলাস হরিদাসীকে অনুকরণ করিয়া একটু বিকৃতকণ্ঠে বলিল,—ধ্যাৎ—কোন কিছু না বুঝেই ধ্যাৎ! আগে একটু চেষ্টা করেই দেখনা।

হরিদাসী ঈষৎ অনুযোগের স্বরে বলিয়া উঠিল,—বা-রে—আমি যে শাঁক বাজাতে এসেছি, আজ যে তোমার পাকা দেখা!

শ্রীবিলাস মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল,—শাঁক বাজাতে এসেছ, আমার মাথা কিনেছ। তবে আর এখানে দাঁড়িয়ে কেন, শাঁকটাই ততক্ষণ বাজাওগে না, যাও।

হরিদাসী ফোঁস করিয়া উঠিল,—খবরদার বিলেস দা, মিছেমিছি আমাকে রাগিয়ো না বলছি, নৈলে কিন্তু ভাল হবে না।

হরিদাসীর মুখের দিকে চাহিয়া শ্রীবিলাস যেন থ মারিয়া গেল। হরিদাসী হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া শ্রীবিলাসের সামনে হইতে মারিল এক ছুট।

ক্ষান্তমণি আসিয়া তাগিদ দিয়া বলিল,—বাবা বিলেস, চটপট একটু সেজেগুজে নে বাবা, আশীর্ব্বাদের সময় হয়ে এলো।

শ্রীবিলাসের বলিবার আর কিছু নাই। ব্যাপার অনেকটা গড়াইয়া গিয়াছে, ক্ষান্তপিসিকে ঠেকা দেওয়া অসম্ভব। ক্ষান্তমণি

ও রাইজী মশায় মিলিয়া সিকদার মহাশয়কেও রীতিমত হাত করিয়াছে। শ্রীবিলাসের কোন দিকে আর পালাইবার পথ নাই। ক্ষান্তমণির তাড়া খাইয়া ভাবিতে ভাবিতে সোজা সে একেবারে বৈঠকখানা ঘরে গিয়া হাজির হইল।

সিকদার মহাশয় প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। শ্রীবিলাসকে দেখিয়া খুশী হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—এই যে বাবাজীবন, এসো এসো, তোমার কথাই হচ্ছিলো।

সৎরঞ্জির একপাশে বসিয়া পড়িল শ্রীবিলাস। বিনা ভূমিকায় অতি বিনীত ভাবে সে আসল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কহিল,—কিছু মনে করবেন না সিকদার মশায়, খোলাখুলি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনার কন্যার বিবাহ কি শেষ পর্য্যন্ত এইখানেই দেব বলে স্থির করলেন?

রাইজী মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—নিশ্চয়ই, এর আর কথা কি, দিন তারিখ পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গেছে।

শ্রীবিলাস একটু কুণ্ঠিত ভাবে সিকদার মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—আমরা শুনেছি আপনার মেয়েটি নাকি সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং যারপরনাই শান্তস্বভাবা।

রাইজী একটু প্রমাদ গণিলেন। সিকদার মহাশয় সোজা লোক, সরল ভাবেই শ্রীবিলাসেয় কথায় সায় দিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—তা যা বলেছ বাবাজী, রূপে গুণে মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। যদি বিশ্বাস না হয় ত নিজে গিয়ে একবার—

শ্রীবিলাস একটু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিল,—আজ্ঞে না, বিশ্বাস আমাদের খুবই হয়েছে, সে জন্য আপনি মোটেই ভাববেন না। কিন্তু আসল কথাটা কি জানেন, স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রতিপালন করবার মত যথেষ্ট শক্তি আমার আছে কি না—সেটা একটু অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছেন কি ?

রাইজী একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—কি যে সব বাজে কথা বলিস !

ক্ষান্তমণি অন্তরাল হইতে দরজার পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া সিকদার মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল,—ওর কোন কথা আপনি শুনবেন না বেয়াই মশাই, চটপট আপনারা কাজ সেরে ফেলুন।

শ্রীবিলাস সহজকণ্ঠে কহিল,—কিন্তু তার আগে তোমার বেয়াই মশায়কে আমার সাংসারিক অবস্থার কথাটা সংক্ষেপে একটু জানিয়ে রাখা ভাল নয় কি !

রাইজী মশায় শ্রীবিলাসকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, —হয়েছে বাবা—হয়েছে, চুপচাপ ওইখানে বস্ দেখি, আশীর্ব্বাদটা এই বেলা চুকিয়ে দেওয়া যাক।

অতঃপর তিনি সিকদার মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, —আপনি কিছু মনে করবেন না সিকদার মশায়, ছেলেটি ওই এক ধরণের ; কথাবার্ত্তা একটু বেশি বলে।

সিকদার মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—এ আর বেশি কথা কি ! আজকালকার শিক্ষিত ছেলেরা একটু স্বাধীন

ভাবাপন্নই হয়ে থাকে। সেজন্য অবশ্য আমি তাদের দোষ দিই না।

শ্রীবিলাস বাধা দিয়া বলিল,—আজ্ঞে না—দোষের কথা হচ্ছে না, কিন্তু দয়া ক'রে আমার উপর যেন অবিচার করবেন না; শিক্ষিত আমি মোটে নই। উঠোউঠি তিন বচ্ছর ক্লাস প্রমোশন পাইনি বলে' স্কুল থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বাস করুন আমার কথা, একবর্ণ মিথ্যে বলিনি।

রাইজী মশায় গর্জ্জিয়া একবার চাহিলেন শ্রীবিলাসের দিকে। শ্রীবিলাস বলিয়া চলিল,—আমার ট্রান্সফার সার্টিফিকেট খানা দেখবেন একবার? কণ্ডাক্টের ঘরে লেখা আছে 'ব্যাড', মাথা ঠুকলেও ছুনিয়ায় কেউ চাকরি দেবে না; অবশ্য সে চেষ্টা আমি করিনি কখনো, আর ভবিষ্যতে করবো বলেও আশা রাখি না; এই টুকুই যা ভরসা।

রাইজী মশায় মৃদু একটা ধমক দিয়া বলিলেন,—চাকরির তোমার দরকারটা কি শুনি। জমি জমা বিষয় সম্পত্তি যা আছে—তিন পুরুষ তোমার পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খেতে কুলোবে।

সিকদার মহাশয়েরও ধারণা তাই। সাগ্রহে তিনি বলিয়া উঠিলেন,—নিশ্চয়ইত, পঞ্চাশ ষাট বিঘে আওয়ল জমির আয়—সে কি বড় কম হলো!

শ্রীবিলাস আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—পঞ্চাশ ষাট বিঘে! কে বললে আপনাকে?

রাইজী রীতিমত ঘামিয়া উঠিলেন। ক্ষান্তমণি দরজার পাশ হইতে পুনশ্চ উঁকি মারিয়া কহিল,—আর পুকুর বাগানের আয়টাই বা কম কি! খুলে একটু বল না রাইজী!

রাইজী মশায় যেন বাঁচিয়া গেলেন, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—সে কি এক একটা পুকুর সিকদার মশায়, প্রকাণ্ড এক একটা দীঘি বললেই হয়। সময় ক'রে যাবেন একবার আমার সঙ্গে, নিজের চোখেই দেখে আসবেন সব।

সিকদার মহাশয়ের ঘর বর সবই পছন্দ হইয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহাকে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা শ্রীবিলাসের হাতে কন্যাটিকে সম্প্রদান করিয়া যথাসত্বর চারিহাত এক করিয়া দেন। কিন্তু ছেলেটি হঠাৎ এমনধারা বিগড়াইয়া বসিল কেন?

রাইজী মশায় ক্ষান্তমণিকে তাড়া দিয়া বলিলেন,—দে-দে—ধান-দূর্ব্বোর থালাটা এইধারে পাঠিয়ে দে, আশীর্ব্বাদটা সেরে ফেলা যাক।

ক্ষান্তমণি পাড়ার একটি মেয়ের হাত দিয়া পাত্র আশীর্ব্বাদের উপকরণাদি সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকখানা ঘরে পৌঁছাইয়া দিল।

রাইজী মশায় শ্রীবিলাসের হাত ধরিয়া একটা টান দিয়া কার্পেটের আসনের উপর জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া বলিলেন,—আর কেন সিকদার মশায়,—উঠুন,—শুভস্য শীঘ্রং।

শ্রীবিলাসের অবস্থা সঙিন হইয়া উঠিল। আসন ছাড়িয়া সে উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে।

সিকদার মশায় দুর্গা শ্রীহরি স্মরণপূর্ব্বক পাত্র আশীর্ব্বাদের জন্য গাত্রোত্থান করিলেন !

শ্রীবিলাস অতিমাত্রায় বিব্রত হইয়া উঠিল, সিকদার মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—দেখুন, বিয়ে করতে আমি কতখানি উৎসুক তা হয়ত আমার ভাবগতিক দেখেই বুঝতে পারছেন ; তবু আপনারা—

সিকদার মশায় হাল্কা ভাবেই জবাব দিলেন,—সে কি একটা কথা হলো বাবাজী ; বসো—বসো—স্থির হয়ে বসো, তোমাদের বয়সে বিবাহ আমরা হেসে খেলে করেছি।

শ্রীবিলাস বলিয়া উঠিল,—কিন্তু আমার যোগ্যতার কথাটা একবার ভেবে দেখছেন না কেন, সেইটাই ত হলো সব চেয়ে বড় কথা।

শ্রীবিলাসের কোন কথাই কেহ শুনতে চাহে না। রাইজী মশায় ধান-দুর্ব্বার থালাখানা তুলিয়া ধরিতেই সিকদার মহাশয় ছোট্ট একটা কাঁসার বাটি হইতে ফোঁটা দিবার জন্য খানিকটা চন্দন তুলিয়া লইলেন। রাইজী মশায় মেয়েদের দিকে চাহিয়া তাড়া দিয়া কহিলেন,—দে—দে—শাঁকটা এবার বাজিয়ে দে, দাঁড়িয়ে তোরা করছিস কি।

সঙ্গে সঙ্গে পোঁ করিয়া শাঁক বাজিয়া উঠিল। শ্রীবিলাসের কর্ণরন্ধ্রে কে যেন ছুঁচ ফুটাইতেছে। কিসের এ শঙ্খধ্বনি, কার জন্য এ উৎসব ! শ্রীবিলাস কি সত্য সত্যই সিকদার-কন্যাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে চলিল নাকি ? কিন্তু রামী ?

শ্রীবিলাসের রামী? তার কথা কি এর মধ্যেই ভুলিয়া গেল শ্রীবিলাস, এত সহজে! না—না—এ হয় না, শ্রীবিলাসের পক্ষে এ সম্ভব নয়।

রাইজী মশায় পুনরায় তাড়া দিয়া বলিলেন,—আর একবার—আর একবার—খুব জোরে।

—পোঁ—ও—ও—

উপর্য্যুপরি শঙ্খধ্বনি। শ্রীবিলাস ধড়মড় করিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল,—সিকদার মশায়, থামুন—থামুন—সব কথা আমার বলা হয়নি এখনো। পাত্র হিসেবে সত্যই আমি অচল; দোহাই আপনার—বিশ্বাস করুন। স্বভাব চরিত্তির আমার মোটে ভাল না, আমার জুড়ি বদমেজাজী ছেলে এ তল্লাটে আপনি খুঁজে পাবেন না; জমি জমা বিষয় সম্পত্তি বিলকুল সব ভাঁওতা, এরা আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে। আমার হাতে মেয়ে দিলে মাঝে মাঝে উপবাস তার অবধারিত জানবেন। পারবেন আপনি সে দুঃখ সহ্য করতে? আমি কিন্তু তা সইতে পারবো না—কোন মতেই সইতে পারবো না, আপনার পা ছুঁয়ে শপথ ক'রে বলতে পারি।

রাইজী মশায় বিক্ষুব্ধ ভাবে বলিয়া উঠিলেন,—কি অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলে রে বাবা, যা মুখে আসে তাই বললেই হলো!

সিকদার মশায় একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—তাইত—বিবাহ করতে ছেলেটি নেহাৎ নারাজ দেখছি!

শ্রীবিলাস সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—আজ্ঞে না, এ ঠিক নারাজের প্রশ্ন নয়, আমার সাংসারিক অবস্থাটা সম্যক আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি মাত্র। এর পরও যদি আমার মত লক্ষী-ছাড়ার হাতে আপনি মেয়ে দিতে চান ত এগিয়ে আসুন; শুধু চন্দনের কৌটা কেন—দইমিষ্টির হাঁড়িগুলো শুদ্ধ এক সঙ্গে আমার মাথায় ঢেলে দিন, আমি আর আপত্তি করবো না। বাজা রে বাজা—শাঁকটা আর একবার বাজা দেখি?

সিকদার মহাশয় বিস্ময়ে হতবাক, রাইজী মহাশয় লজ্জায় অধোমুখ হইলেন।

দূর হইতে দেখা গেল লক্ষী মালিনী ধপ্‌ধপে শাদা পদ্মফুলের মত এক চুপড়ি ভাজা মুড়ি মাথায় করিয়া শ্রীবিলাসদের সদর দোরের সামনে দিয়া গৃহস্থবাড়ী যোগান দিতে চলিয়াছে। শ্রীবিলাস লক্ষীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা সিকদার মশায়, আপনার মেয়েটি কি ওর চেয়েও সুন্দরী? ওই যে ওই চুপড়ি মাথায় যাচ্ছে ওই মালীদের মেয়েটি,—বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখুন ত। আমি কিন্তু বিশ্বাস করবো না—তামা তুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে বললেও আমি বিশ্বাস করবো না।

সিকদার মহাশয় চক্ষু দু'টি বিস্ফারিত করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—সে কি বাবাজীবন, এ তুমি কি বলছো!

রাইজী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া একবার লক্ষীর দিকে একবার শ্রীবিলাসের দিকে চাহিয়া ক্ষোভে ও দুঃখে হঠাৎ গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—কুলাঙ্গার ছেলে কোথাকার, মুখুজ্যে বংশের কলঙ্ক!

এমন সময় থিয়েটার পার্টির ছোকরারা সব হৈ চৈ করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া শ্রীবিলাসকে সংবাদ দিল,—রাজুচক্রবর্ত্তী সরকারী বাঁশঝাড় দখল করিয়াছে, ষ্টেজ বাঁধিবার জন্য একটি বাঁশও সে ছাড়িয়া দিতে রাজী নয়; যে কয়েকটা বাঁশ কাটা হইয়াছিল—লোকজন দিয়া সেগুলি পর্য্যন্ত রাজু চক্রবর্ত্তী জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে।

শ্রীবিলাস খাপ্পা হইয়া চোখ তাড়িয়া কহিল,—বাঁশঝাড়ের মালিক ত রাজু চক্রবর্ত্তী একা নয়, আমাদেরও কয়েক জনের ওতে অংশ আছে। ওর আপত্তি আমরা শুনবো কেন!

থিয়েটার পার্টির একটি ছোকরা বলিয়া উঠিল,—সে কথা আমরা বলেছিলাম, রাজু চক্রবর্ত্তী কোন কথাই গ্রাহ্য করলে না।

শ্রীবিলাস দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল,—গ্রাহ্য করবে ওর বাপ, চল্ তোরা আমার সঙ্গে—কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে, একবার দেখে আসি।

এই বলিয়া শ্রীবিলাস সামনে কিছু না পাইয়া বৈঠকখানা ঘরের কোণ হইতে সিকদার মশায়ের মোটা বেতের লাঠি গাছটা হঠাৎ তুলিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি সরকারী ঝাড়ে বাঁশ কাটাইবার জন্য সদলবলে রওনা হইয়া গেল।

সিকদার মহাশয় দেখিয়া শুনিয়া একেবারে হাল ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা জন্মিল—ছেলেটির স্বভাব চরিত্র মোটে ভাল নয়, হয়ত বা দস্তুর মত নেশা-ভাঙ করে; উপরন্তু সে রীতিমত গুণ্ডাও বটে।

রাইজী মশায় বিব্রত হইয়া তামাক সাজিতে ভিতর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেই অবসরে সিকদার মহাশয় বৈঠকখানা ঘর হইতে বাহির হইয়া গাড়োয়ানকে ডাকিয়া সত্বর গাড়ী জুতিবার আদেশ দিলেন। আর নয়—বাড়ী ফিরিতে হইবে।

গাড়োয়ান নিতাইচরণ মনিব মহাশয়ের স্যুটকেশ, কম্বল ও অন্যান্য জিনিষপত্রগুলি সযত্নে গাড়ীর উপর চাপাইয়া লইয়া করজোড়ে নিবেদন করিল,—আজ্ঞে আপনার লাঠি ?

সিকদার মহাশয় একটু বিরক্তির স্বরে কহিলেন,—আর লাঠি চাই না—চল্, লাঠি গেছে বাঁশ কাটতে।

কথাটা বেশ নিতাই চরণের বোধগম্য হইল না, পুনরায় সে বলিয়া উঠিল,—আজ্ঞে ?

সিকদার মহাশয় ছইয়ের মধ্যে মাথা গলাইতে গলাইতে তাড়া দিয়া কহিলেন,—হাঁকা—হাঁকা—গাড়ী ছেড়ে দে।

## সমাজপতি

রাজু চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানা ঘরে মজলিস বসিয়াছে। গ্রামের কয়েকজন লোক ডাকাইয়া শ্রীবিলাসের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে দলে টানিবার চেষ্টা করিতে লাগিল রাজু চক্রবর্ত্তী। যেমন করিয়া হোক বিলাস মুখুজ্যেকে জব্দ করিতে হইবে। আজ সে জোর করিয়া সরকারী ঝাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া লইয়া গেল, কাল হয়ত বাগানের আম কাঁঠাল ভাঙ্গিবে, পরশুদিন মাথায় ডাঙ্গস মারিয়া বাড়ী হইতে ঘটী বাটি ছিনাইয়া লইয়া যাইতেই বা কতক্ষণ। তার মত গুণ্ডাব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব নয় কিছুই। তার পর চরিত্রটি যা দিন দিন গড়িয়া উঠিতেছে, সে আর বলিবার নয়। কোন্ দিন যে সে পথে ঘাটে ভদ্র বাড়ীর বৌ-বেটীদের পর্য্যন্ত অসম্মান করিয়া বসিবে না, তাই বা কে জোর করিয়া বলিতে পারে। এখন হইতেই সাবধান হওয়া দরকার।

রাজু চক্রবর্ত্তী রাগে ফুলিতে লাগিল। কয়েক খণ্ড বাঁশের প্রশ্ন এখানে বড় কথা নয়, রাজু চক্রবর্ত্তীর মর্য্যদায় সে ঘা দিয়েছে; এ দম্ভ তার অসহ্য। বাঁশঝাড়ের ব্যাপার লইয়া আদালতে একটা ফৌজদারী মামলা রুজু করিয়া দিলেই চলিতে পারিত, কিন্তু মামলা মোকদ্দমায় থানা পুলিস সাক্ষী প্রমাণের হাঙ্গামা আছে, উকিল আমলা আদালতের খরচাও বড় কম নয়, সুতরাং

ওদিক দিয়া বেশ সুবিধা হইবে না। এ সব ক্ষেত্রে চাণক্যনীতি প্রয়োজন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজু চক্রবর্ত্তী স্থির করিয়া ফেলিয়াছে—অন্য একটি প্যাঁচে ফেলিয়া শ্রীবিলাসকে জব্দ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে অপ্রত্যাশিত সুযোগও একটা জুটিয়া গিয়াছে। গ্রামের মধ্যে আবছা একটা গুজব রটিয়াছে, আর আবছাই বা বলা যায় কেন, ব্যাপারটা পুরোপুরি সত্যি; শ্রীবিলাসকে সমাজচ্যুত করিবার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না। শ্রীবিলাস আজ পরনারী সংস্পর্শে কলুষিত, লক্ষী মালিনীর সংসর্গে তার জাতিপাত ঘটিয়াছে। প্রয়োজন হইলে দশজনের সামনে সাক্ষী প্রমাণ হাজির করিয়া রাজু চক্রবর্ত্তী এ কথা প্রমাণ করিয়া দিবে। শ্রীবিলাসকে একঘরে করা ছাড়া সমাজের গত্যন্তর নাই,—এই কথাটাই পাঁচজনকে বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে।

রাজু চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানা ঘরে যে কয়েকজন প্রতিবেশী আসিয়া সমবেত হইয়াছে তাহাদের প্রায় অধিকাংশই রাজু চক্রবর্ত্তীর খাতক। খত কবুলতি সুদ-বন্ধকীতে হাত-পা তাদের বাঁধা। সুতরাং প্রকাশ্যে তাহার বিরোধিতা করিবার মত সাহস ইহাদের নাই। কিন্তু তাই বলিয়া গায়ে পড়িয়া শ্রীবিলাসের সঙ্গে বিরোধ বাধাইবার মত উৎসাহ বা প্রবৃত্তিও কাহারো নাই। শ্রীবিলাসের মধ্যে এমন কিছু বেচাল তাহারা এ পর্য্যন্ত কেহ লক্ষ্য করে নাই, যার জন্য তাহাকে সমাজচ্যুত করা যাইতে পারে। সম্প্রতি যদি তেমন কিছু ঘটিয়াও থাকে, তাহা হইলেও

প্রকাশ্যে তাহা সাব্যস্ত করা শক্ত। এ সব আভ্যন্তরীণ ব্যাপার লইয়া শ্রীবিলাসকে ঘাঁটাইতে গেলে ফল হয়ত তার বিপরীত হইবে। লক্ষ্মী মালিনীর সহিত তাহার অবৈধ ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ করিবে কে!

রাজু চক্রবর্ত্তী গোড়া হইতেই বলিয়া আসিতেছে,—সে ভার আমার। পুনরায় সে সকলের সামনে সায় পুরিয়া বলিল,—সে ভার আমার, এ সব ব্যাপারে সাক্ষী প্রমাণের অভাব হয় না; ওই রাখালে বেটাকে দিয়েই আমি প্রমাণ ক'রে দিব যে বিলেস মুখুজ্যে জোর ক'রে তার বাড়ী ঢুকেছিলো। রাখাল মালাকার যদি নিজের মুখে স্বীকার করে—তা হলে সব বিশ্বাস করবে ত?

এর পর আর অবিশ্বাসের কোন প্রশ্ন আসে না। সুতরাং সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইল—ব্যাপার যদি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা সামাজিক ভাবে শ্রীবিলাসের সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে।

দিন দুই তিন পরেই গ্রামস্থ পরেশ গাঙ্গুলীর মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সরকারী চণ্ডীমণ্ডপে যোল আনা ব্রাহ্মণের এক মজলিস বসিবে। সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গেল, সাক্ষী প্রমাণ যদি ইতিমধ্যে সব ঠিক হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই মজলিসেই শ্রীবিলাসের প্রসঙ্গটিও যথারীতি উত্থাপন করিয়া তার যথোপযুক্ত বিচার দাবী করা হইবে। এ প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত কেহ আর

আপত্তি করিল না, সমবেত সকলেই একে একে সায় পুরিয়া গেল।

মৌতাতের সময় হইয়াছে। সভা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে রাজু চক্রবর্ত্তীর পিয়ারের নোকর শ্রীমান মথুর গোপ তাড়াতাড়ি সাজ সরঞ্জাম বাহির করিয়া গুলির ছিটা প্রস্তুত করিবার জন্য ছোট্ট একটা এলুমিনিয়ামের বাটি করিয়া হাত-উনানে আফিঙ চড়াইয়া দিল। অহিফেন ঘটিত নেশা ভাঙের অভ্যাস মথুর গোয়ালার কোন কালেই ছিল না, মাঝে মাঝে এক আধ টান গাঁজা টানিয়াই তার চলিয়া যাইত। রাজু চক্রবর্ত্তীর হাল-কৃষাণি লওয়ার পর হইতে এ বিষয়ে যথেষ্ট তার উন্নতি হইয়াছে, গাঁজা এবং গুলি—দুইটাই এখন সমান চলে মথুরের। মনিব ঠাকুরের অনুগ্রহে দেখিতে দেখিতে মথুর গোপ প্রায় মানুষ হইয়া উঠিল। রাজু চক্রবর্ত্তীর সহকারী ও সাকরেদ, হালশানা ও জোতদার,—মথুর গোপ একাধারে সব।

গ্রামবাসীদের বিদায় করিয়া দিয়া রাজু চক্রবর্ত্তী পরম নিশ্চিন্তে মৌতাতে বসিয়া চণ্ডু সেবনে মনযোগ দিল।

বাড়ী ফিরিবার পথে বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী ও রঘু চাটুজ্যের মধ্যে কথা বার্ত্তা চলিতেছিল শ্রীবিলাসের প্রসঙ্গ লইয়া। বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী বলিতেছে,—আমার কিন্তু ভাই বিশ্বাস হয় না, বিলেস মুখুজ্যে আর যাই হোক—ওর কুচরিত্তির কথা কিন্তু এ পর্য্যন্ত শোনা যায় নি।

রঘু চাটুজ্যে একটু স্বর টানিয়া বলিল,—বলা যায় না ভায়া, বয়েসটা যে ভয়ানক বেয়াড়া। ও বয়েসে আমরা—মানে যৌবন কালের কথা বলছি, অর্থাৎ কিনা—

রঘু চাটুজ্যে তাড়াতাড়ি কথাটা আবার সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একটা অর্থপূর্ণ হাসির আমেজ খেলিয়া গেল বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তীর ঠোঁটের ডগায়। রঘু চাটুজ্যের কথায় সায় দিয়া সে বলিয়া উঠিল,—যা বলেছ।

রঘু চাটুজ্যে একটু চোখ তাড়িয়া বলিল,—কিন্তু সে যাই হোক—এটা কিন্তু ভারী মজার কথা বিন্দেবন ভায়া,—রাজু চক্রবর্ত্তী বলে কিনা বিলেস মুখুজ্যে পতিত! আরে তুই বেটা যে কতগণ্ডা বউরী ধাঙ্গড় পর্য্যন্ত পার ক'রে বসে আছিস, বুড়ো বয়েসে দুলেনী নিয়ে ঘর করছিস, তুই বেটাকে পতিত্ত করে কে!

বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী একটু গম্ভীর ভাবে বলিল,—কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে শোষ তক কিন্তু সাপ উঠবে ভায়া, এ আমি তোমাকে বলে রাখলাম। বিলেস মুখুজ্যেও ছেড়ে কথা কইবে না, শেষ পর্য্যন্ত লাঠালাঠি ফাটাফাটি না হলে বাঁচি।

রঘু চাটুজ্যে একটু উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠে,—আহা—দেয় বেটা চশমখোরের ভুঁড়ি শুদ্ধ ফাঁসিয়ে! ভুঁড়ি একদিন ওর ফাঁসবেই, ওই বিলেস মুখুজ্যেই দেবে কোন্ দিন ওর ভবলীলা শেষ ক'রে।

বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী পরমানন্দে সায় দিয়া বলিয়া উঠে,—তা হলে

ত দেনার দায়ে বেঁচে যাই, আজীবনটা বেটার তমস্থুকের সুদ গুণতে গুণতেই ফতুর হয়ে গেলুম।

সকাল বেলা মহাজনী দপ্তরটি খুলিয়া রাজু চক্রবর্ত্তী দেনা পাওনার হিসাব করিতে বসিয়াছে। কাহার কত সুদ বাকি, কোন্ খাতকের হ্যাণ্ডনোট কখন নাগাদ তামাদি হইয়া যাইবে, কাহার বন্ধকী অলঙ্কার ছাড়াইয়া লইবার কড়ারী মেয়াদ উত্তীর্ণ হইতে চলিল,—এই সব তথ্যগুলি রাজু চক্রবর্ত্তী একটি ফাসা কাগজে নোট করিয়া লইতে লাগিল। গ্রামস্থ ষোল আনার মজলিস বসিবার পূর্ব্বেই গ্রামবাসী খাতকগণের সহিত তার দেনা পাওনা ও হিসাব বাকির মোটামুটি একটা হদিস জানিয়া রাখা আবশ্যক। কখন কাহাকে কি ভাবে জব্দ করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে, কে বলিতে পারে। তা ছাড়া মালিমামলাও দুই এক নম্বর দায়ের করিতে হইবে, খাতকদের মধ্যে কেহ কেহ কিস্তি খেলাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাজু চক্রবর্ত্তী গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে মহাজনী খাতাখানা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া সূচী পত্রের পাতা উল্টাইতেছিল। মথুর গোপ আসিয়া সংবাদ দিল,—রাখাল মালাকারকে ডাক দেওয়া হইয়াছে, গরু ক'টা পালে দিয়া এক্ষুনি সে আসিয়া পড়িবে।

রাজু চক্রবর্ত্তী শালু কাপড়ে মোড়া ছোট্ট একটি দপ্তর খুলিয়া কাগজের তাড়া হইতে একটি হ্যাণ্ডনোট বাহির করিয়া একধারে

সরাইয়া রাখিল। রাখাল মালাকারকে হিসাবটা আজ একবার শুনাইয়া দিতে হইবে। কড়া রকমের তাগাদাও একটা দিয়া রাখা ভাল।

হুঁকা হইতে কলিকাটি নামাইয়া মথুরের দিকে আগাইয়া দিয়া রাজু চক্রবর্ত্তী চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল;—লক্ষীকে বলেছিলি ?

মথুর গোপ জবাব দিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ—বলেছি বৈকি, বলি খুড়োঠাকুর তোর হাতের ভাজা মুড়ি খুব পছন্দ করে, সময় ক'রে যাস একবার—চাল একখোলা ভেজে দিয়ে আসবি। লখী কিন্তু ইদিকে আসতে চায় না, ওর মতলব বেশ ভাল মনে হচ্ছে না খুড়োঠাকুর !

রাজু চক্রবর্ত্তী কহিল,—কাদিকেও একবার যেতে বলেছিলাম, কে জানে হারামজাদী গিয়েছিলো কি না ! ওর ভাবগতিক বেশ ভাল বোধ হয় না, কোন্ দিন না আবার বিপদে ফেলে দেয়। কাদিকে শেষ পর্য্যন্ত জুতো মেরেই তাড়াতে হবে দেখছি।

দূর হইতে রাখাল মালাকারকে আসিতে দেখিয়া রাজু চক্রবর্ত্তী তাহাকে আপ্যায়িত করিয়া কহিল,—এই যে রাখালে, আয়—আয়, তোকে আজ একবার ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

রাখাল মালাকার জোড়হাত কপালে ঠেকাইয়া ব্রাহ্মণ দেবতার উদ্দেশে 'প্রাতঃ প্রণাম' নিবেদন করিল। তালপাতার একটা চাটাইয়ের উপর বসিয়া পড়িল রাখাল। কলিকায় একটা সুখটান মারিয়া মথুর গোপ জলন্ত কলিকাটি রাখালের দিকে বাড়াইয়া দিল।

রাজু চক্রবর্ত্তী বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করিয়া বসিল রাখালকে,—হ্যাণ্ডনোটের টাকা দিচ্ছিস কখন বল্ দেখি ?

রাখাল মালাকার একটু বিস্ময়ের স্বরে বলিল,—টাকা ? আজ্ঞে ই বছর ত আমার টাকা দিবার কথা নয়।

রাজু চক্রবর্ত্তী কহিল,—কিন্তু স্বদে আসলে মোট দাঁড়ালো কত—হিসেব রাখিস ? ও টাকা ত আর আমি ফেলে রাখতে পারবো না রাখাল !

রাখাল মালাকার বিনীত ভাবে কহিল,—টাকা ই বছর দিতে পারবো না খুড়ো ঠাকুর ! কি রকম দুর্বৎসরটা গেল, নিজের চোখেই দেখলেন ত !

রাজু চক্রবর্ত্তী একটু ভারিক্কি চালে বলিল,—তা বললে ত মহাজনের চলে না ! টাকা তোকে দিতেই হবে, যেমন করে হোক। টাকা না থাকে জমি বেচবি, ভিটেমাটি বন্ধক রেখে যেমন ক'রে হোক দেনা শুধবি, খাতকের মুখ চাইতে গেলে কি মহাজনের চলে !

রাখাল মালাকার বার দুই তিন ঢোক গিলিয়া বলিল,—আজ্ঞে সে কথা যদি বলেন কর্ত্তা, তা হলে আর কথা কি। ভিটে-মাটি যেটুক খানি আছে, দরকার হয় আপনি নীলেম ক'রে নিন। ঘর দোর ছেড়ে আমরা চলে যেতে রাজি আছি, পথে পথে না হয় ভিক্ষে মেগেই খাব,—মোদ্দা টাকা আপনার আসছে সনের আগে কোন মতেই দিতে পারবো না।

রাজু চক্রবর্ত্তী একটু সুর নামাইয়া কহিল,—আহাহা—ভিক্ষে মাগার কথা হচ্ছে না রাখাল, ঘরদোর ছেড়ে চলেই বা তোকে

যেতে হবে কেন। তবে কি না দেনা পাওনার ব্যাপার, কথাটা একটু খেয়াল রাখিস ; সময় মত যেন না চাইতেই পাই।

রাখাল একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল,—আজ্ঞে খেয়াল আছে বৈকি, আপনার সঙ্গে কথার খেলাপ ত কোন দিনই করিনি।

রাজু চক্রবর্ত্তী স্বর পাল্টাইয়া বলিয়া উঠিল,—হাঁ ভাল কথা, তোর নামে যে একটা নালিশ আছে, রাখাল! টান—টান কল্‌কেটা টেনে লে, বলছি।

রাখাল মালাকার একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—আজ্ঞে নালিশ —আমার নামে? কি নালিশ বলুন।

রাজু চক্রবর্ত্তী একটু গম্ভীর ভাবে বলিল,—বিলেস মুখুজ্যের সঙ্গে তোর মেয়েটার যে কেমন কেমন শুনছি রাখাল, খবর টবর রাখিস কিছু?

রাখালের হাতের কল্‌কে হাতেই রহিয়া গেল, তামাক টানা আর হইল না; মুখখানা তার মড়ার মত শাদা হইয়া গেল। কোন রকমে ধাক্কাটা একটু সামলাইয়া লইয়া ঈষৎ ভাঙ্গা গলায় বলিয়া উঠিল রাখাল,—আজ্ঞে লখী ত আমার তেমন মেয়ে নয়, এ আপনি কি বলছেন, খুড়ো ঠাকুর!

রাজু চক্রবর্ত্তী একটু জোর দিয়া বলিল,—খাঁটী কথাই বলছি, ব্যাপার যা ঘটেছে তাই বলছি; বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস কর মথরোকে।

রাখাল মালাকার আর একটা ধাক্কা খাইল। মথুর গোপ

সায় দিয়া বলিল,—রটনা ত সেই রকমই শোনা যাচ্ছে, আর রটনাই বা বলি কেন, আমি ত এক রকম নিজের চোখেই—

কি আশ্চর্য্য, এমন কথাও আজ শুনিতে হইল রাখালকে, রাখালের সামনে এ কথা উচ্চারণ করিতে এতটুকু বাধিল না রাজু চক্রবর্ত্তীর! তার উপর কিনা মথুর গোপ তার সাক্ষী! এই সব কথা শুনাইবার জন্যই কি রাখালকে আজ ডাকা হইয়াছে!

রাখালের বুকের শিরাগুলায় কে যেন মোচড় দিয়া টানিতে লাগিল। লক্ষী যে ভ্রষ্টচরিত্রা—এ কথা সে কোন মতেই ভাবিতে পারে না। মৃদুকণ্ঠে কহিল রাখাল,—দোহাই খুড়োঠাকুর, ওকথা আর বলবেন না। মেয়ে আমার নিষ্পাপ, মাথার উপর ভগবান সাক্ষী; ও কথা আপনারা ভুল শুনেছেন।

রাজু চক্রবর্ত্তী মৃদু একটা ধমক দিয়া বলিল,—ফের বেটা বাজে তর্ক করছিস, গাঁ শুদ্ধ যে ঢি ঢি পড়ে গেছে, তুই ও কথা বললেই হবে!

রাখাল মালাকার নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। কি যেন এক অব্যক্ত বেদনার চাপে রাখালের কণ্ঠ বুঝি রুদ্ধ হইয়া গেল। রাজু চক্রবর্ত্তী পুনরায় কহিল,—তার চেয়ে এক কাজ কর, গাঁয়ের পাঁচজন ভদ্রলোকের হাতে পায়ে ধরে ব্যাপারটা এই বেলা মিটিয়ে নে। আমরা তোকে যেমন ক'রে হোক বাঁচিয়ে দিব, তোকে আমি কথা দিচ্ছি।

রাখাল মালাকার যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। রাজু চক্রবর্ত্তীর কথাগুলা সে শুনিতে পাইল কি না ঠিক বোঝা গেল না। রাজু

চক্রবর্ত্তী পুনরায় ভরসা দিয়া কহিল,—বিলেস মুখুজ্যেকে আমরা জব্দ ক'রে ছেড়ে দিব রাখাল, সে জন্যে তুই ভাবিস না। তোকে কিন্তু মজলিসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে হবে যে বিলেস মুখুজ্যে জোর ক'রে তোর বাড়ী ঢুকেছিলো, ব্যস্—শুধু এইটুকু।

রাখাল মালাকারের ব্রহ্মরন্ধ্রটা যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। মুখচোখ তার লাল হইয়া উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—আজ্ঞে মাপ করবেন, ওকথা আমি জান গেলেও বলতে পারবো না। আপনারা কি মনে করেন কত্তা, মান ইজ্জৎ বলে আমাদের কি কোন পদাত্থই নাই?

রাজু চক্রবর্ত্তী রাখালের কথায় জোর দিয়া বলিল,—আরে আমিও ত সেই কথাই বলছি। মান ইজ্জৎ সকলেরি আছে, আর তা আছে বলেই এসব ক্ষেত্রে একটু কড়াকড়ি দরকার। আমি তোর ভালোর জন্যেই বলছি রাখাল, কেন মিছেমিছি কতকগুলো টাকা পয়সার ফেরে পড়ে যাবি! তার চেয়ে যা বললাম, কথাটা একটু ভেবে দেখ।

রাখাল মালাকার নিঝুম মারিয়া গিয়াছে। রাজু চক্রবর্ত্তীর কোন কথারই আর জবাব দিল না। রাজু চক্রবর্ত্তী পুনরায় কহিল,—আর দেখ—কি যেন বলছিলাম, হাঁ—তোর ওই হ্যাণ্ডনোটের কথা। তা না হয় কিছু ছাড়বাদ করেই দিস, সুদ আর আমি নিতে চাই না, যখন খুশি তোর আসলে আসলে—

রাখাল মালাকার দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—আজ্ঞে না—টাকা আপনি সুদসমেত পুরোপুরিই পাবেন, একটি পয়সাও আপনার

মারা যাবে না। আর এই মাসের মধ্যেই যেমন ক'রে হোক হ্যাণ্ডনোট আমি খালাস করবো, আপনাকে আমি কথা দিয়ে গেলাম।

রাখাল মালাকারের বুক ফাটিয়া কান্না পাইতেছিল। কোন রকমে চোখের জল সামলাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি সে রাজু চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া টলিতে টলিতে রাস্তায় গিয়া নামিল। যাবার সময় চক্রবর্ত্তীকে মাথা নোয়াইয়া একটা প্রণাম পর্য্যন্ত করিয়া যাইতে ভুলিয়া গেল রাখাল, রাখালের পক্ষে এটা আজ ব্যতিক্রম।

রাজু চক্রবর্ত্তী রাখাল মালাকারের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিয়া উঠিল,—দেখেছ—বেটা মালীর দেমাকটা একবার দেখেছ!

মথরো গোয়ালা চোখ পাকাইয়া বলিল,—ধরে এনে আচ্ছা ক'রে দিয়ে দিব নাকি ঘা কতক?

রাজু চক্রবর্ত্তী বাধা দিয়া বলিল,—এখন না—থাক্, আগে ওদের বাপ বেটাকেই নেড়ে চেড়ে একটু দেখে নেওয়া যাক্, তারপর একান্তই যদি—আচ্ছা মথরো, ঠিক পারবি ত—সেদিন তোকে যা বলেছিলাম?

মথরো গোয়ালা চোখ দুইটা একটু চাড়িয়া ঈষৎ দন্ত বিকশিত করিয়া বলিল,—লাল ঘুঁড়া ছুটিয়ে দিতে? সে আমি খুব পারবো খুড়োঠাকুর, আপনি শুধু হুকুম করলেই হলো।

রাজু চক্রবর্ত্তী ইসারায় মথুর গোপকে থামাইয়া দিয়া বলিল,—

চুপ.—কাদি আসছে, ওর সামনে আর কোন কথা নয়, হারাম-জাদীকে বিশ্বাস নাই।

চণ্ডীদাস নাটকের অভিনয় রজনী আসিয়া পড়িয়াছে। থিয়েটার পার্টির উদ্যোক্তাগণ ষ্টেজ বাঁধাবাঁধি স্থরু করিয়া দিয়াছে। আখড়াঘরে বসিয়া শ্রীদাম বৈরাগীর সঙ্গে শ্রীবিলাসের খোসগল্প চলিতেছিল। শ্রীবিলাসের নৈতিক প্রসঙ্গ লইয়া রাজু চক্রবর্ত্তী ও কয়েকজন গ্রামবাসীর মধ্যে এক আধটু আলাপ আলোচনার কথা ইতিপূর্ব্বেই শ্রীদাম বৈরাগীর কর্ণগোচর হইয়াছে। কথায় কথায় শ্রীদাম হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল,—আচ্ছা দাদাঠাকুর, ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি ; যা শুনছি—সে কি সত্যি ?

শ্রীবিলাস অতি সহজ কণ্ঠে জবাব দিল,—মিথ্যে নয় ছিদেম, সত্যি সত্যি এবার প্রেমে পড়ে গেছি।

শ্রীদাম বৈরাগী একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—প্রেমে পড়ে গেছ, কার সঙ্গে বল দেখি ?

শ্রীবিলাস একবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অনুচ্চস্বরে হঠাৎ গান ধরিয়া দিল :—

চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ জরে ভোর।

বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল শ্রীদাম,—এঁ্যা,—বল কি দাদা ঠাকুর,—'চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি'! তা মাঝে মাঝে আমরা নীল শাড়ী ওকে পরতে দেখেছি। তা হোক—তুমি কবুল করো না—কবুল করো না, ও রকম লটখটি অনেকেরি হয়। একঘরে করবে না কচু করবে, নিজের চোখে দেখেছে কোন বেটা!

শ্রীবিলাস হাসিয়া বলিল,—ভয় কি ছিদেম, প্রেমে যখন পড়েই গেছি—তখন আর একঘরে হতে ভয়টা কিসের। ভেক নিয়ে এবার বোরেগী হব, বুঝলি ছিদেম। ছোট খাট একটা আখড়া খুলে কোথাও বসে পড়বো। চেলা ত তুই আছিস, একটা গোপীযন্ত্র আর গাবগুবি তুই যোগাড় ক'রে রাখিস; না কি বল্?

এই বলিয়া শ্রীবিলাস হো হো করিয়া আর এক চোট হাসিয়া উঠিল। শ্রীদাম বৈরাগী বিরক্ত হইয়া বলিল,—আঃ—কি যে তুমি বল দাদা ঠাকুর!

শ্রীবিলাস হাসিয়া কহিল,—সত্যি বলছি ছিদেম, লক্ষী আমাকে বিবাগী না ক'রে কোন মতেই আর ছাড়লে না।

শ্রীদাম বৈরাগী একটু চোখ তাড়িয়া বলিল,—কিন্তু দোহাই দাদা ঠাকুর, রাত বেরাত যেন একলাটি আর যাওয়া আসা করো না। কে কোন্ ফাঁকে দেখে ফেলে বলা যায় কি! রাগের মাথায় দিলেই যদি কেউ মাথা টাথা ফাটিয়ে!

শ্রীবিলাস হঠাৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—দূর বোকা আহাম্মক কোথাকার, এই তোর কাণ্ডজ্ঞান হলো! প্রেম

ভালবাসার সঙ্গে রাত বেরাত যাওয়া আসার সম্বন্ধ যে একটা থাকতেই হবে, এমন কোন কথা আছে কি! তুই একটি এক-নম্বর ইডিয়ট দেখছি।

শ্রীদাম যেন একটু ঘাবড়াইয়া গেল, আমতা আমতা করিয়া বলিল,—সে আবার কি রকমটা হলো দাদা ঠাকুর, এ যে তুমি ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিচ্ছ বাবা!

আর একবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল শ্রীবিলাস। সঙ্গে সঙ্গে সে সুর করিয়া আবার গান ধরিয়া দিল :—

রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম<br>
কামগন্ধ নাহি তায়।<br>
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ<br>
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥

শ্রীদাম বৈরাগী সামনের শ্রীখোলটি তাড়াতাড়ি টানিয়া লইয়া শ্রীবিলাসের গানের সঙ্গে প্রেমসে হঠাৎ সঙ্গত সুরু করিয়া দিল। শ্রীদাম বাজায় ভাল।

বামুনপাড়া হইতে বাড়ী ফিরিয়া রাখাল মালাকার একটা খাটিয়ার উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। রাজু চক্রবর্ত্তীর কথাগুলা তখনো তার মনের মধ্যে তীরের মত বিঁধিতেছিল।

লক্ষী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। রাখালকে একটু মনমরা দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েছে বাবা, অমন ক'রে বসে পড়লে যে!

লক্ষীর মুখের দিকে চাহিয়া রাখালের দু'চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি সে চোখ মুছিয়া বলিল,—কিছু হয়নি মা, আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়া দেখি, ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে।

লক্ষী একটি পাথর-বাটি করিয়া একটুখানি কাঁচা গুড় ও এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল লইয়া পুনরায় রাখালের সামনে.আসিয়া দাঁড়াইল। রাখাল হঠাৎ তাচ্ছিল্যের স্বরে একটু রুক্ষভাবে বলিয়া উঠিল,—থাক্ থাক্—একেবারে চান ক'রেই খাব, ওসব এখন রেখে দে গা যা।

লক্ষী ব্যস্তভাবে কহিল,—সে কি বাবা, তোমার যে ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে!

রাখাল তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—আঃ—কেন বিরক্ত করিস! বললাম ত এখন খাব না,—ব্যস্!

রাখালের এই আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া লক্ষী অবাক হইয়া গেল। এর কারণ সে কিছুমাত্র বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। লক্ষী বিস্মিত ভাবে কিছুক্ষণ রাখালের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। রাখালের মনের তন্ত্রীতে কোথায় যেন একটু সুর কাটিয়া গিয়াছে, লক্ষী ঠিক ধরিতে পারিল না।

# অভিনয়

ষ্টেজ বাঁধা সমাপ্ত হইয়াছে। সারা গাঁ ঢাক ঢোল পিটাইয়া 'অদ্য রজনী' ঘোষণা করা হইল। গ্রামের থিয়েটারে চণ্ডীদাস নাটক অভিনীত হইবে। থিয়েটার পার্টির মেম্বারগণ বহুদিন ধরিয়া আখড়া দিয়া পালা সাধিয়াছে, দোরে দোরে ধন্না দিয়া চাঁদা তুলিয়াছে, প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া আসর সাজাইয়াছে। দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতৃবর্গের দেহমন মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল। দশখানা গ্রাম ভাঙ্গিয়া দর্শকগণ দলে দলে আজ তাহাদের থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে আসিবে। এ অঞ্চলে মঞ্চ বাঁধিয়া পর্দা টাঙ্গাইয়া নাটকাভিনয় এই প্রথম। দলের ছোকরাদের তোড়জোড় ও হাঁক ডাকে সারা গ্রামে হৈ-হৈ কাণ্ড পড়িয়া গিয়াছে। গ্রামবাসিগণ রৈ-রৈ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সময় থাকিতে বারোয়ারি তলায় গিয়া একে একে সমবেত হইতে লাগিল। শ্রীবিলাস দলবল সহ সাজঘরে রঙ মাখিতে বসিয়াছে। চণ্ডীদাসের সাজ সজ্জা শেষ করিয়া নিজের হাতে সে রামীর এলো খোঁপায় শ্বেতপুষ্পের একগাছি মালা জড়াইয়া দিল। কৃষ্ণযাত্রার রাধিকাকে শ্রীবিলাসের অনুরোধে পড়িয়া থিয়েটারে রামীর অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। রামী তাহকে মানাইয়াছে চমৎকার।

কনসার্ট পার্টির ঐক্যতান বাদ্য সুরু হইয়া গেল। বারোয়ারি তলায় দর্শকদের ভিড় লাগিয়া গিয়াছে, চারিদিক লোকে লোকারণ্য। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বহুদিন যাবৎ এই থিয়েটারের অভিনয় দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল। যথা সময়ে তাহারা যে যার আপনার আসন দখল করিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। ভিন্ন গ্রাম হইতেও দর্শক সমাগম বড় কম হয় নাই। বারোয়ারি তলা গম্ গম্ করিতেছে।

রাজু চক্রবর্ত্তীর দল থিয়েটার পার্টির সমারোহ পণ্ড করিবার জন্য যথা সাধ্য নাকি চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু শ্রীবিলাসের দলকে কোন মতেই আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। অগত্যা শেষ পর্য্যন্ত তাহারা হাল ছাড়িয়া দিয়া বারোয়ারি তলার এক প্রান্তে তামাক টানিতে টানিতে জটলা পাকাইতে বসিয়াছে। রাজু চক্রবর্ত্তী অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া দূর হইতে চারিদিক একবার লক্ষ্য করিয়া গেল। পিয়ারের নফর মথুর গোপ তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে।

ঐক্যতান বাদ্য সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের সামনের পর্দ্দা সরিয়া গেল। দর্শকগণের বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালির শব্দে বারোয়ারি তলা ভাঙ্গিয়া পড়ে আর কি! কয়েক জন ভলাণ্টিয়ার গোলমাল থামাইবার জন্য চীৎকার করিতে করিতে গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, ছুটাছুটি হুটাপুটি করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। অসংখ্য কণ্ঠ পরস্পরকে শান্ত করিবার জন্য বিপুল উৎসাহে একসঙ্গে সব চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে,—চুপ—চুপ,—আস্তে।

ভলাণ্টিয়ার দলের আপ্রাণ চেষ্টায় পুরুষের দল কিঞ্চিৎ শান্ত হইল বটে, কিন্তু মেয়েদের হৈ-চৈ আর থামিতে চাহে না। কদম পিসি পদ্ম মাসীর সঙ্গে বসিবার ঠাঁই লইয়া বিরোধ বাধাইয়াছে, হরিদাসীর সহিত কালোশশীর ঠেলাঠেলির বিরাম নাই। ওপাড়ার কল্পর মা বেপরোয়া গল্প জুড়িয়াছে, তিলি-বৌয়েরা ননদভাজে পাল্লা দিয়া ছেলে কাঁদাইতেছে। হাটতলার একচেটিয়া বস্ত্র ব্যবসায়ী মেজো দত্তের সেজো মেয়ে জমকালো একখানা জর্জেট শাড়ী পরিয়া থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছে। অকারণে সে ঘন ঘন জর্জেটের আঁচল ঘুরাইতেছিল। তাই দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী এক ঘোষনন্দিনীর বারো গাছা সোনার চুড়ি টুন্ টুন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। এমন সময় মুখুজ্যেদের পান্নার বোন আন্নাকালী পানের পিক ফেলিতে গিয়া ফেলবি ত ফেল একেবারে ঘোষালগিন্নীর গায়েই। এই আর যায় কোথা, উভয় পক্ষে হাতাহাতি বাধে আর কি।

মেয়েদের গোলমালের ঠেলায় শ্রোতৃবর্গ অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। থিয়েটারের অভিনয় ওদিকে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, এদিকের হৈ-চৈ কিন্তু থামিতে চাহে না। এমন সময় রঙ্গমঞ্চ হইতে জনৈক অভিনেতা বীরবিক্রমে এমন এক হুঙ্কার করিয়া উঠিল যে তারপর আর কারো কোন কথাই চলিতে পারে না। চারিদিক হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল।

নান্নুরের জমিদার তার অপদার্থ গোমস্তাকে কঠোর কণ্ঠে ভর্ৎসনা করিতেছে। সামান্য এক সহায় সম্বলহীনা রজকিনীকে

প্রলোভনে বশীভূত করিবার শক্তি যাহার নাই, অপদার্থ ছাড়া তাহাকে আর কি বলা যাইতে পারে। জমিদার বাবু ভ্রূকুটি করিয়া গোমস্তার প্রতি হুকুম জারি করিলেন,—এক সপ্তাহের মধ্যে রজকিনী রামীকে ধরিয়া আনিয়া কাছারি বাড়ীতে হাজির করিয়া দিতে না পারিলে সেরাস্তা হইতে তাহাকে দূর করিয়া দেওয়া হইবে। কথায় না হয় অর্থ আছে, অর্থে না হয় পাইক পিয়াদা লাঠিয়ালের অভাব নাই; যেমন করিয়া হোক রামীকে তার চাই। এত কাল প্রজা ঠেঙ্গাইয়া ও দশখানা গ্রামের সমাজ পরিচালনা করিয়া চুলে যাহার পাক ধরিয়া গেল, তার অপমান করিতে সাহস করে কিনা সামান্য একটা ধোপার মেয়ে! রূপ-যৌবনের দর্প তার চূর্ণ করিতে হইবে!

জমিদারবেশী ব্রজকিশোর দাঁকে কে একজন সাবাস দিয়া বলিয়া উঠিল,—বলিহারি ভাই, বহুৎ আচ্ছা!

প্রথম দৃশ্য শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘড় ঘড় শব্দে পর্দ্দাখানি উপর দিকে উঠিয়া গেল।

পরবর্ত্তী দৃশ্য বাঁধের ঘাট। মঞ্চের পশ্চাদ্ভাগে নীল রঙের একখানি পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কল্পিত এক জলাশয়ের দৃশ্য। পর্দ্দাখানি ঝুলিতেছে, ফুরফুরে হাওয়ায় দুলিতেছে ও ফুলিতেছে, মাঝে মাঝে পৎ পৎ শব্দে উড়িতেছে পর্য্যন্ত। তা উড়ুক,—রঙ্গে ভরা বঙ্গদেশের রঙ্গালয়গুলির সৌজন্যে সংশ্লিষ্ট মঞ্চশিল্পিগণের অপরূপ শিল্পনৈপুণ্য ও কারুকলার নিদর্শন স্বরূপ রঙ্গমঞ্চে শুধু জলাশয় কেন—ঘরবাড়ী, বনজঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত,

প্রমোদোদ্যান, মোগল শিবির ও মারাঠা ছাউনি হইতে আরম্ভ করিয়া রাজপথ, বনপথ, বধ্যভূমি ও মহাশ্মশান পর্য্যন্ত অনেক কিছু আমরা উড়িতে দেখিয়াছি। সুতরাং উক্ত দোদুল্যমান পর্দ্দাখানিকে নান্নুরের ধোপাপুকুর বলিয়া ধরিয়া লইতে আমাদের কোন বাধা নাই।

রামী ধোপানী ময়লা কাপড়ে সাবান ঘষিতে ঘষিতে আপন মনে গান ধরিয়াছে :—

বঁধু কি আর বলিব তোরে।

অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া

রহিতে না দিলি ঘরে॥

গলাখানি ছোকরার চমৎকার। রামীর গানেই চটপট আসর জমিয়া গেল। দর্শকদের প্রসংশমান উৎসুক দৃষ্টি হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে রামীর দিকে।

শ্রীবিলাস চণ্ডীদাস সাজিয়া মঞ্চের একপাশে অপেক্ষা করিতেছে, রামীর গানের শেষ চরণ গাহিতে গাহিতে তাহাকে প্রবেশ করিতে হইবে। শ্রীদাম বৈরাগী খোল বাজাইতে বাজাইতে শ্রীবিলাসের গায়ে একটা ঠেলা দিয়া বলিল,—দাদা ঠাকুর, গাওনা কিন্তু জমে গেইছে ভীষণ।

শ্রীবিলাস তন্ময় হইয়া রামীর গান শুনিতে লাগিল। তাহারই হাতে গড়া কৃষ্ণযাত্রার ছোকরাটিকে রামী সাজাইয়া আজ ষ্টেজে নামানো হইয়াছে। রামীর গানের পরতে পরতে শ্রীবিলাসের অন্তরের স্পর্শ যেন জড়াইয়া রহিয়াছে। এই গান—ঠিক এই

গানখানি একদিন সে পদ্মবাঁধের ঘাটে লক্ষী মালিনীকে গাহিতে শুনিয়াছিল,—'কি আর বলিব তোরে।'

লক্ষীর মুখখানি জ্বল্ জ্বল্ করিয়া শ্রীবিলাসের মনের পর্দ্দায় ভাসিয়া উঠিল। লক্ষী কি আজ থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছে? আসিবার ত কথাই। আছে হয়ত পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে একধারে কোথাও বসিয়া।

কোঠাঘরের উপর-তলায় মাদুরের উপর পড়িয়া পড়িয়া লক্ষী তখন ছটফট করিতেছিল। ইচ্ছা করিয়াই সে থিয়েটার দেখিতে যায় নাই। কিছুদিন যাবৎ শ্রীবিলাসের সান্নিধ্য সম্পূর্ণ সে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে। পদ্মবাঁধের ঘটনাটা ঘটিয়া যাওয়ার পর হইতে লক্ষী এ বিষয়ে অতিমাত্রায় সজাগ। পাছে তার নামের সঙ্গে শ্রীবিলাসের নাম জড়াইয়া গাঁয়ের লোকে বদনাম রটায়. এই ভয়ে লক্ষী সব সময় তটস্থ।

নিস্তব্ধ নিশুতি রাত। বারোয়ারি তলায় থিয়েটারের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। পরিচিত একটি গানের সুর লক্ষীর কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল,—'বঁধু কি আর বলিব তোরে।' নিজের অজ্ঞাতেই লক্ষী যেন ক্রমশঃ চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। পদ্ম-বাঁধের ঘটনাটা লক্ষীর মনটাকে যেন ঝড়ের বেগে একবার দুলাইয়া দিয়া গেল। কেন সে মরিতে পথে ঘাটে সেদিন অমন ভাবে গান গাহিতে গিয়াছিল! গান যদি গাহিলই ত থিয়েটারের গান ছাড়া কি অপর কোন গান ছিল না! কিন্তু এমন গান ত

জীবনে কখনো শোনে নাই লক্ষী—'কি আর বলিব তোরে'। বিলেস ঠাকুর কলিকাতা হইতে নূতন এ গান আমদানি করিয়াছে। অর্থ হয়ত ঠিক মত এর বোঝে না লক্ষী, কিন্তু তবু মনে হয় কত সুন্দর, মনে হয় যেন এমনটি আর জীবনে কখনো শুনিনি।

শিয়রের দিকে উপর কোঠার জানালা খোলা। জানালার নীচে কার যেন চাপা গলার শব্দ! লক্ষী হঠাৎ চমকিয়া উঠিল,—কে যেন তাহাকে ফিস্ ফিস্ করিয়া ডাকিতেছে,—লখী—ও লখী!

লক্ষী ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া চাহিতেই স্পষ্ট তার চোখে পড়িল কে একটা লোক তার শিয়রের দিকে জানালার নীচে চুপ চাপ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে। লক্ষীর সর্ব্বাঙ্গ দুব্ দুব্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। লোকটা চাপা গলায় পুনরায় বলিয়া উঠিল,—লখী, ঘুমুলি?

লক্ষী একটু ভয় পাইয়া বলিল,—কে?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল লোকটা,—চুপ—আমি মথরো।

রাগে লক্ষীর আপাদমস্তক জলিয়া উঠিল—দিনরাত তাহার পিছনে লোক লাগাইয়া মথরোর মনিব তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। লক্ষী রাগে আগুন হইয়া বলিল,—তোর সাহস ত বড় কম নয় মথরো, এত রাত্রে ফের তুই আমাকে জ্বালাতে এসেছিস!

মথরো একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল,—খুড়োঠাকুর একবার খবরটা লিতে পাঠালেন, তাই—

লক্ষী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল,—ঝাঁটা মারি—ঝাঁটা মারি তোর খুড়ো ঠাকুরের মুখে, দূর হ তুই এখান থেকে।

পিছন দিক হইতে চাপা গলায় আর একজন কে ডাক দিলে,—মথরো, ইদিকে আয়।

গুরুতর আশঙ্কায় লক্ষীর মুখ শুকাইয়া গেল। কে ও লোকটা? মথরোর মনিব নাকি!

মুহূর্ত্তের মধ্যে বাড়ীর পিছন দিকের আম বাগানের পথ ধরিয়া লোক দুইটা আবার অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। লক্ষী তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

বারোয়ারি তলায় চণ্ডীদাস নাটকেব অভিনয় খুব জমিয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীদাসের ভূমিকায় শ্রীবিলাসের অভিনয় ও পদ-কীর্ত্তন অসংখ্য দর্শকচিত্তকে মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়া তুলিয়াছে। রামী ও চণ্ডীদাসের অনাবিল অধ্যাত্ম প্রেম নাটকীয় ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে অপরূপ মাধুর্য্যে যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সন্দিগ্ধ সমাজপতিগণের কূটবিচারে চণ্ডীদাস আজ পাতিত্য অপরাধে অপরাধী। ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া সে রজকিনীর প্রেমে পড়িয়াছে, ব্রাহ্মণকুলের কলঙ্ক সে। চণ্ডীদাসকে তাই একঘরে করিবার জন্য সমাজচাঁইগণ কৃতসঙ্কল্প। রজকিনী রামী ও তার আত্মীয় স্বজনেরা জমিদারের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। রামীকে হয়ত জন্মের মত গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। উপযুক্ত

প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত চণ্ডীদাসের সমাজে আর ঠাঁই নাই। গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে চণ্ডীদাস ক্ষতবিক্ষত। কোন্ অপরাধে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহাকে জাতে উঠিতে হইবে, কোন মতেই সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। রামীকে ভালবাসিয়া চণ্ডীদাস কি সত্যই কোন অপরাধ করিয়াছ? কিন্তু ভালবাসা—সে ত পাপ নয়; সে যে জীবনের চির কাম্য, সে যে আত্মার মহা বৈভব। প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্ন তবে উঠে কেন?

অভিনয় দর্শকগণ অপলক নেত্রে রঙ্গমঞ্চের দিকে চাহিয়া আছে। রামী ও চণ্ডীদাসের ব্যথা ও বেদনার ভারে অন্তর তাহাদের ভারাক্রান্ত। চণ্ডীদাস আবার গান ধরিল:—

'শোনরে মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই॥'

রামী অশ্রুসিক্ত নয়নে ধীরে ধীরে আসিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। চণ্ডীঠাকুরের গানের ভাষায় তার সকল কুণ্ঠা, সকল সন্দেহ দূর হইয়া গিয়াছে,—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

রামী চণ্ডীদাসের পায়ে নিঃশেষে নিজেকে উজাড় করিয়া সঁপিয়া দিয়া পা দু'টি তার জড়াইয়া ধরিয়া গানের সুরে কহিল:—

'বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি॥'

ভাব ও রসগ্রাহী শ্রোতৃবর্গের দু'চোখ দিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হইতে রামী ও চণ্ডীদাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতৃদ্বয়কে অভিনন্দিত করা হইল কয়েক গাছি গাঁদা ফুলের মালায়। আসরের চারিদিক হইতে ঘন ঘন করতালি বর্ষিত হইতে লাগিল। দর্শকগণের মধ্যে রীতিমত একটা উদ্দীপনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

দর্শকদের পিছন দিক হইতে রঘু চাটুজ্যে বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তীর গায়ে একটা ঠেলা দিয়া বলিল,—বিলেস মুখুজ্যের মতলবটা কি বল দেখি, ভায়া! পালাগানের নজির দেখিয়ে আগে থেকেই সাফাই গেয়ে রাখছে নাকি? রাজু চক্রবর্ত্তী ধরেছে কিন্তু ঠিকই।

বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী সায় দিয়া বলিল,—আরে সেই নিয়েই ত থিয়েটারের একটা পালা লিখে ফেললে বিলেস মুখুজ্যে নিজে।

রামী ও চণ্ডীদাসের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সাজ ঘরেও একটা চাঞ্চল্যের ঝড় বহিয়া গেল। চণ্ডীদাস নাটকের আশাতীত সাফল্যে থিয়েটার পার্টির উদ্যোক্তাগণ নাটমঞ্চের অন্তরালে রীতিমত গড্ডলিকা নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে।

অতঃপর রামী ধোপানীর গৃহদাহের পালা। বোতল পাঁচেক মেথিলেটেড স্পিরিট ও দশ সের ধুনা আমদানি করা হইয়াছে ঘর পোড়ানোর চমকপ্রদ দৃশ্য দেখাইবার জন্য। দৃশ্যখানি সাজানো হইতে লাগিল।

শ্রীবিলাস এই ফুরসতে সাজঘরের বাহির হইয়া কয়েক মিনিটের জন্য পিছন দিকের ফাঁকা মাঠটায় গিয়া দাঁড়াইল; বুদ্ধির ঘরে একটু ধোঁয়া দিতে হইবে। তাড়াতাড়ি একটি

সিগারেট ধরাইয়া শ্রীবিলাস দুই একটান মাত্র টানিয়াছে, এমন সময় কাদি দুলেনী ষ্টেজের পিছন দিক দিয়া হন্তদন্ত হইয়া ছুটিতে ছুটিতে শ্রীবিলাসের সামনে আসিয়া হাজির। কাদি চাপা গলায় একটা ডাক দিল,—বিলেস ঠাকুর!

শ্রীবিলাস কাদিকে দেখিয়া কহিল,—এ কি—কাদি যে, তুই হঠাৎ কি মনে ক'রে?

কাদি দুলেনীর মুখ দিয়া কথা সরিতেছে না, একটুখানি থামিয়া আবার ভারী গলায় সে বলিয়া উঠিল,—ওরা আগুন লাগাবার চেষ্টা করছে, মথরো গোয়ালাকে আমি নিজের চোখে—

রঙ্গমঞ্চের দিকে শ্রীবিলাসের মন পড়িয়াছিল, কাদির কথা তার কানে ঢুকিল না। তাড়াতাড়ি সে অন্যমনস্ক ভাবে বলিয়া উঠিল,—আগুন—আগুন নিয়ে কি হবে, মথরোকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস,—যাঃ।

কাদি দুলেনী আরও কি যেন বলিবার চেষ্টা করিতেছিল, শ্রীবিলাস একটু বিরক্তির স্বরে বলিল,—কি আপদ, এখান থেকে তুই যা দেখি!

শ্রীবিলাস তাড়াতাড়ি ধূমপান শেষ করিয়া সাজ ঘরের দিকে আবার ছুটিয়া গেল। রঙ্গমঞ্চে আগুন দেখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

থিয়েটার পার্টির কর্ম্মিগণ শ্রীবিলাসের নির্দ্দেশ মত চটপট সব কাজে লাগিয়া গেল। টুকরা দৃশ্যে সাজানো হইয়াছে রামী ধোপানীর কুটীর। তারি মধ্যে ব্যবস্থা করিয়া কয়েক বোতল

স্পিরিট ঢালা হইয়াছে। জমিদারের অনুচর আসিয়া মশালের আগুন ঠেকাইয়া দিতেই কুটীরের দৃশ্য হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। উইংশের পাশ হইতে ধুনাগুঁড়া ছিটাইয়া আগুনের ফুল্কি পর্য্যন্ত দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কুঁড়ে ঘর খানি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

দর্শকদের চোখের পলক ফেলিবার অবসর নাই, গৃহদাহের চমকপ্রদ দৃশ্য দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। জনৈক মাতব্বর ব্যক্তি চীৎকার করিয়া কহিলেন,—হুঁসিয়ার—পর্দ্দায় যেন আগুন না ধরে।

পর্দ্দায় আগুন ধরিবার উপায় আছে কি! থিয়েটার পার্টির কয়েকজন কর্ম্মী জলভরা বালতি হাতে রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে পূর্ব্ব হইতেই খাড়া হইয়া আছে। দর্শকদের উদ্দীপনার সীমা নাই, সকলের মুখে এক কথা,—বিলেস মুখুজ্যে একটা দলের মত দল করিয়াছে বটে!

নাটকের দৃশ্য খুব জমিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় দর্শকদের মধ্য হইতে ভয়ার্ত্তকণ্ঠে হঠাৎ চীৎকার উঠিল,—আগুন—আগুন—আগুন লেগেছে।

চীৎকার ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। কিন্তু কোথায় আগুন! দর্শকগণ হঠাৎ এমন চঞ্চল হইয়া উঠিল কেন!

শ্রীবিলাস ক্ষিপ্রবেগে রঙ্গমঞ্চের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। জনতা ছত্রভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীবিলাস চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—বস্থন—বস্থন,—ভয় পাবেন না আপনারা

—বসে পড়ুন; আগুন আমরা নিবিয়ে ফেলছি, বসুন—বসুন।

কে কাহার কথা শোনে! সমবেত গ্রামবাসিগণ দিক দিগন্ত ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। আগুন লাগিয়াছে গ্রামের এক প্রান্তে, আকাশ ফুঁড়িয়া দেখা দিয়াছে তার পুঞ্জীভূত লেলিহান শিখা। গ্রামবাসিগণ চীৎকার ও হল্লা করিতে করিতে সেই দিকেই ছুটিতে লাগিল।

আগুন—আগুন—

কোথায় আগুন?

কার বাড়ী আগুন লেগেছে রে?

কেমন ক'রে আগুন লাগলো?

কার ঘরে—কার ঘরে?

আগুন—আগুন—জল—জল—

মালী পাড়ায় আগুন লাগিয়াছে! থিয়েটার পার্টির কর্মিসঙ্ঘ তাড়াতাড়ি সাজ গুটাইতে আরম্ভ করিল। শ্রীবিলাস কয়েকজন ভলাণ্টিয়ার সঙ্গে লইয়া বালতি হাতে করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিল মালী পাড়ার দিকে।

# রহিতে নারিনু ঘরে

রাখাল মালীর ঘরে আগুন লাগিয়াছে। পাড়ার লোকজন সব যে যার আপনার ঘর সামলাইতে ব্যস্ত। অপর পাড়া হইতেও বিস্তর লোক আসিয়া জমা হইয়াছে, কিন্তু জলাভাব বশতঃ আগুন নিভাইবার সুবন্দোবস্ত করিতে পারা যায় নাই! রাখাল মালীর বাড়ীর সামনে গ্রামবাসী জনতার ভিড় ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে দর্শকের সংখ্যাই অধিক, কাজের লোক কম। অধিকাংশ লোকই অনর্থক চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইতেছে, উদ্দেশ্যহীন ছুটাছুটি হুটাপুটি করিয়া আসল কাজে যৎপরোনাস্তি ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। যে কয়েকজন খাটিয়া খুটিয়া জল ঢালিয়া আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিতেছিল, শ্রীবিলাস গিয়া দলবলসহ চটপট তাহাদের সঙ্গে কাজে লাগিয়া গেল। নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী ও কাছাকাছি পাতকুয়াগুলি হইতে যথাসাধ্য জল বহিবার ব্যবস্থা করা হইল।

বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী, রঘু চাটুজ্যে ও হরু ভটচাযি প্রমুখ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণগণ রাখাল মালীর জলন্ত গৃহখানির দিকে চাহিয়া তটস্থভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পান সুপারি, গব্যঘৃত, উপবীত সূত্র ও নব বস্ত্রখণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিদেবকে তাঁহারা শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন,—হে ব্রহ্মণ্যদেব, রক্ষা কর— রক্ষা কর!

কতকগুলি স্ত্রীলোক অপগণ্ড শিশু-সন্তান সহ উচ্চকণ্ঠে কান্না জুড়িয়াছে। রাখাল মালাকার উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কাতর কণ্ঠে শুধু ইষ্টদেবকে স্মরণ করিতে লাগিল,—নারায়ন! নারায়ন! আমার এত বড় সর্ব্বনাশ কেন করলে প্রভু!

অধিক রাত্রে আগুন লাগিয়াছে। আগুন যে হঠাৎ কেমন করিয়া লাগিল কেহই বলিতে পারে না। পাড়াপ্রতিবেশীদের অধিকাংশই থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিল। 'আগুন' 'আগুন' চীৎকার শুনিয়া তাহারা ছুটিয়া আসিয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের হেতু সম্বন্ধে কাহারো কোন ধারণাই নাই।

কতকগুলি উৎসাহী কর্ম্মীর আপ্রাণ চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই অগ্নিদেবের প্রকোপ কিছুটা শান্ত হইয়া আসিল। পাড়ার অন্যান্য বাড়ীগুলি এ যাত্রা কোন রকমে রক্ষা পাইয়া গেল, কিন্তু রাখাল মালীর ঘর দুই খানি কোন ক্রমেই বাঁচাইতে পারা গেল না। ছোট ঘরখানি আগেই পুড়িয়াছে, বড় কোঠাঘরখানি রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না, ছোট ঘরের আগুনের শিখায় কোঠাঘরের খড়োচাল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

রাখাল মালীর সদর দোরের সামনে অসম্ভব ভিড় জমিয়া গিয়াছে। রাজু চক্রবর্ত্তী প্রমুখ গ্রমবাসী মাতব্বরগণ যথা সময়ে ঘটনা স্থলে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। গভীর রাত্রে অকস্মাৎ এই অগ্নিকাণ্ডের হেতু কি, এই লইয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে তুমুল একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ বলে—রাখাল মালী

গাঁজা খাইতে খাইতে আগুন লাগাইয়াছে, কেহ বলে—সে কথা ঠিক নয়, সন্ধ্যার পরই রাখাল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। রাখাল মালাকারের ভগ্নী গিরি মালিনী গুড়ুক খায় বলিয়াও কেহ কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিল। কিন্তু গিরি মালিনী আজ কয়েক দিন যাবৎ বাড়ী নাই, কুটুম্ব বাড়ী গিয়াছে; সুতরাং তার গুড়ুক খাওয়া বা না-খাওয়ার সঙ্গে এই অগ্নিকাণ্ডের কোন সম্পর্কই থাকিতে পারে না। আগুন যখন লাগে, রাখালের বাড়ী কেহ জাগিয়া ছিল না, পাড়াপড়শীরাও সব ঘুমাইয়া ছিল। তাহা হইলে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হইল কোথা হইতে? এত রাত্রে কে আগুন লাগাইল?

কেহ কেহ এই আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডকে সম্মুখস্থ বিল্ববৃক্ষে অধিষ্ঠিত বাবা ব্রহ্মচারীর খেলা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিল, কেহ কেহ ইহাকে সাব্যস্ত করিল প্রেতযোনীর ক্রিয়াকলাপ বা নিছক একটা ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া। রাখাল মালীর পরিবার মারা যাওয়ার পর পুষ্করা পাইয়াছিল, রীতিমত তিন পোয়া দোষ; গয়া ত আর দেয় নাই রাখাল!

সম্ভব অসম্ভব জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল আরও অনেক রকম। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই, চাক্ষুষ কোন প্রমাণ কেহ হাজির করিতে পারিল না। সকলের কাছেই ব্যাপারটা যেন দস্তুরমত রহস্যজনক বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। কে বলিবে, কেমন করিয়া আগুন লাগিয়াছে।

রাজু চক্রবর্ত্তী চুপচাপ এতক্ষণ একপাশে দাঁড়াইয়া আলাপ আলোচনাগুলি শুধু শুনিয়াই যাইতেছিল। সমবেত গ্রামবাসিদের

লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞের মত সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—ব্যাপারটা বেশ ভাল ক'রে তলিয়ে বোঝ সব। এই যে একটা এত বড় অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপার, এ কি সহজ কথা হলো!

কথাটা যে খুব সহজ হইল না, তাহা ত সকলেই টের পাইতেছে; কিন্তু আসল কথা হইল—এই দুর্ভেদ্য রহস্যটি ভেদ করিবে কে, যত কিছু গোলমাল ত ওইখানেই।

গোলমাল ভিতরে যতই থাকুক—রাজু চক্রবর্ত্তীর কাছে কিন্তু ইহা জলের মত পরিষ্কার। রাজু চক্রবর্ত্তী একটু চোখ তাড়িয়া বলিল,—পাপ—পাপ—বুঝেছ, যেখানে অনাচার—সেইখানেই দেবতার কোপদৃষ্টি। রাখালের বাড়ীতে যা পাপ ঢুকেছে, গাঁ-কে গাঁ ছারখার ক'রে তবে ও পাপ বিদেয় হবে।

হরু ভটচায্যি একটু গরম হইয়া কহিল,—তার ত একটা বিহিত হওয়া দরকার। অনাচার অনাছিষ্টি যদি কিছু ঘটেই থাকে, সমাজ তা চোখ বুজে সহ্য করবে কেন!

রাজু চক্রবর্ত্তী একটু স্বর চড়াইয়া কহিল,—সমাজ কি আর আছে হে, ভদ্রস্ত সমাজ বলে কিছু নাই আর। সমাজের যদি আঁটোয়ারাই থাকবে, তবে আর বিলেস মুখুজ্যের এত বড় আস্পর্দ্ধাটা হবে কেন! রাখালে মালী হলো কিনা তার এক কল্কের ইয়ার। তার উপর তার মেয়েটাকে নিয়ে—বলি যত কিছু গলদ ত ওইখানেই, পাপ কি আর গাছে ফলে! রাখালে বেটা জেগে ঘুমুচ্ছে, ও বেটার ঘর পুড়বে না ত ঘর পুড়বে কার!

হরু ভটচায্যি আর একটু উষ্ণ হইয়া উঠিল,—এর কিন্তু একটা বিহিত হওয়া উচিত ; রাখালেকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে এটা বামুন কায়েতের গাঁ, ওসব কাণ্ড এখানে চলবে না বাপু। না—কি বল বিন্দেবন ?

বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী একটু নিলিপ্ত ভাবে আমতা আমতা করিয়া কহিল,—তা ব্যাপারটা অবশ্য ধরতে গেলে,—কিন্তু খুড়ো, ওসব কথা কেই বা কাকে বলে, আর কেই বা ও কথা শুনে।

হরু ভটচায্যি জোর গলায় বলিয়া উঠিল,—শুনতে হবে বৈকি —আলবাৎ শুনতে হবে।

রাজু চক্রবর্ত্তী চোখ পাকাইয়া কহিল,—মথরো, ডাক দেখি একবার রাখালেকে।

রাখাল মালীর কোঠাঘরে আগুন জ্বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে ও ঘরখানিও শেষ হইয়া গেল। এতগুলি লোকের আপ্রাণ চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম শেষ পর্য্যন্ত কোন কাজেই লাগিল না। রাখাল মালী হতাশ ভাবে উঠানের একধারে বসিয়া পড়িল। কপালে করাঘাত করিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। তার মাথা গুঁজিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত আজ আর অবশিষ্ট রহিল না।

মথুর গোপ গিয়া রাখাল মালীকে ডাক দিতেই চোখের জল মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে সে উঠিয়া আসিল। তার সদর দোরের সামনে গ্রামের মুখ্যব্যক্তিগণ রাখালেরই প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতেছে। রাখাল আসিয়া সামনে দাঁড়াইতেই রাজু চক্রবর্ত্তী গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল,—রাখালে, দাঁড়া বেটা—

এইখানে দাঁড়া। তোর বাড়ীতে হঠাৎ এমন ধারা আগুন লাগে কেন, কোত্থেকে এলো এই আগুন ?

রাখাল মালী হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—কি জানি খুড়ো ঠাকুর, কে যে আমার এমন্ ধারা সর্ব্বনাশ করলে ! চোখে ত কিছু দেখি নি, কেমন ক'রে বলি বলুন !

রাজু চক্রবর্ত্তী একটা ধমক দিয়া বলিল,—ওরে হারামজাদা, আগুন যে তুই বাড়ীর মধ্যে পুষে রেখেছিস, আগুন খুঁজতে বাইরে যেতে হবে কেন ! সোমত্ত মেয়েটাকে দিয়ে কারবারটি যা চালু করেছিস সে আর আমাদের জানতে কিছু বাকি নাই। দিন দুপুরে আরও কত পেল্লায় কাণ্ড হবে, দেখে নিস শেষ তক আমার কথা।

রাখাল মালাকারের গায়ে সপাং করিয়া কে যেন এক ঘা চাবুক কষিয়া দিল। রুদ্ধশ্বাসে বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া কাতর কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল,—দোহাই খুড়ো ঠাকুর, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা আর দিয়ো না। আপনার জুলুম আমরা অনেক সহ্য করেছি, মুখ ফুটে কোন কথাই বলিনি। কিন্তু দোহাই আপনার, আমার মেয়ের নাম নিয়ে কোন কথা আপনি বলবেন না, সেটি কিন্তু আর কোন মতেই সহ্য করতে পারবো না।

হরু ভটচায্যি একটু স্বর নামাইয়া বলিল,—চটিসনে রাখাল, ব্যাপারটা ভাল ক'রে বোঝ; তোর বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ আছে।

অভিযোগ যে একটা কিছু আছে, রাখাল তাহা আগেই টের পাইয়াছে। রাজু চক্রবর্ত্তী যে রাখালকে অপদস্থ করিবার জন্য

অনেক দিন হইতেই ভিতরে ভিতরে একটা মতলব আঁটিতেছিল, রাখালের তাহা অজানা নাই।

রাজু চক্রবর্ত্তী রাখালের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—বামুনের পায়ে হাত দিয়ে বল্ দেখি বেটা, বিলেস মুখুজ্যে তোর বাড়ী আসা যাওয়া করে কিনা?

রাখাল একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—এ কথার মানে?

রাজু চক্রবর্ত্তী নির্ব্বিকার চিত্তে জবাব দিল,—মানে আর কি, বিলেস মুখুজ্যে তোর মেয়েটার খপ্পরে পড়েছে,—এই মানে; এ কথা তুই অস্বীকার করতে পারিস?

রাখাল মালাকার তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিল,—কক্ষনো না, এ সব আপনি হিংসে ক'রে রটাচ্ছেন, আপনাকে আমি চিনি না!

রাজু চক্রবর্ত্তী গর্জ্জিয়া উঠিল,—কি এত বড় আস্পর্দ্ধা বেটা মালীর, জুতিয়ে বেটার মুখ ভেঙ্গে দিব না! মথরো, ধর ত বেটাকে।

মথরো গোয়ালা এতটুকু দ্বিধা করিল না, সঙ্গে সঙ্গে সে রাখাল মালাকারকে শক্ত করিয়া ঝাপটাইয়া ধরিল। চারিদিক হইতে সকলেই হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, রাখাল মালাকার নিজেও এতটা আশা করে নাই।

রাখাল মালাকারের কোঠাঘরের কড়িকাঠে পর্য্যন্ত আগুন ধরিয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই সময় কোঠাঘর খানি হুড়মুড় করিয়া ধ্বসিয়া পড়িল। ঘরের মধ্যে যৎসামান্য তৈজস পত্রাদি যাহা

কিছু ছিল, সেগুলিও শেষ পর্য্যন্ত আর রক্ষা পাইল না ; ভিতর ঘরে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

শ্রীবিলাস একটা মইয়ের উপর উঠিয়া আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কোঠাঘরখানি ধ্বসিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে সে হতাশ হইয়া পড়িল। রাখাল মালাকার, আহা বেচারী !

বাইরের দিক হইতে তুমুল একটা হট্টগোল শোনা যাইতেছে। লক্ষী মালিনী ঝড়ের বেগে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া শ্রীবিলাসের সামনে দাঁড়াইল। কাতর কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল,—বিলেস ঠাকুর, শিগ্গীর এদিকে ছুটে এসো একবার, বাবাকে ওরা অপমান করছে।

শ্রীবিলাস একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল, ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। লক্ষী শ্রীবিলাসের হাত ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া টানিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীবিলাস হল্লা শুনিয়া বিস্মিত ভাবে কহিল,—বাইরে ওরা গোলমাল করছে কে ?

লক্ষী জবাব দিল,—রাজু চক্রবর্ত্তী আর মথরো গোয়ালা। বিনা দোষে বাবাকে ওরা মারধোর করতে আরম্ভ করেছে।

রাজু চক্রবর্ত্তী, আর মথরো গোয়ালা !

কাদি দুলেনীর কথাগুলো হঠাৎ শ্রীবিলাসের মনে ভাসিয়া উঠিল। কি যেন তখন বলিতেছিল কাদি,—মথরো গোয়ালা, আগুন, আরো যেন কি সব। শ্রীবিলাসের কেমন যেন একটা সন্দেহ হইল, ব্যাপারটা যেন কিছু কিছু এখন বোঝা যাইতেছে।

রাজু চক্রবর্ত্তীর হুঙ্কার শোনা যাইতেছিল। শ্রীবিলাস আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি সদর দোরের দিকে আগাইয়া চলিল।

মথরো গোয়ালা রাখাল মালাকারের গলায় গামছা বাঁধিয়া টানিয়া ধরিয়াছে। রাজু চক্রবর্ত্তী চটি জুতা দিয়া সেই অবস্থায় তাহাকে উপর্য্যুপরি প্রহার করিতেছিল। শ্রীবিলাস শশব্যস্তে ছুটিয়া গিয়া তার সামনে দাঁড়াইতেই রাজু চক্রবর্ত্তী একটু থতমত খাইয়া গেল। শ্রীবিলাস ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল,—এ আপনি কি করছেন, থামুন।

রাখাল মালাকারের দু'চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতেছে। ভাঙ্গা গলায় সে বলিয়া উঠিল,—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বিলেস ঠাকুর, ওরা আমাকে একেবারেই মেরে ফেলুক; এ অপমান আর সহ্য হয় না।

মথরো গোয়ালা রাখাল মালাকারকে গামছা দিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছে, পালাইবার তার উপায় নাই। শ্রীবিলাস মথরোর দিকে চাহিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—ছাড় বেটা গোয়ালা—ছেড়ে দে বলছি, নৈলে এখনি মার খেয়ে গুঁড়ো হয়ে যাবি।

রাজু চক্রবর্ত্তী ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল,—তার মানে ?

মথরো গোয়ালা রাখাল মালাকারকে আরো শক্ত করিয়া টানিয়া ধরিল। শ্রীবিলাস দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল,—তবে রে বেটা শয়তান, গুণ্ডামি ক'রে ক'রে বুকের পাটা বেড়ে গেছে, না ? ভেবেছ মথুর গোপের মত শক্তিমান এ তল্লাটে আর নাই।

হরু ভটচায্যি মাঝখান হইতে বলিয়া উঠিল,—আহাহা—থেমে যাওনা বাপুরা, কাজ কি একটা হাঙ্গাম হুলুস্থুল বাধিয়ে।

শ্রীবিলাস মথরো গোয়ালার হাত ধরিয়া একটা ঝাঁকি দিয়া রাখাল মালাকারকে মুক্ত করিয়া দিল। মথরো একটু রুখিয়া উঠিতেই শ্রীবিলাস তার ডান হাতের কব্জিটা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল।

বহুলোক আগুন নিভাইতে আসিয়াছিল। রাখাল মালাকারের দোরের সামনে আসিয়া একে একে সকলেই তাহারা ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

মথরো গোয়ালার কব্জি ধরিয়া শ্রীবিলাস রীতিমত মোচড় দিতে আরম্ভ করিয়াছে। মথরো একটু উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল,—খবরদার ঠাকুর, বাড়াবাড়ি করো না বলছি।

শ্রীবিলাস রাগে গুর গুর করিয়া কাঁপিতেছিল। মথরো গোয়ালার হাত ছাড়িয়া হঠাৎ সে তার বাঁ-গালে জোর ভরতি কষিয়া দিল এক থাপ্পড়। একটি থাপ্পড়েই মথুর গোপ কাৎ হইয়া এক ধারে ছিটকাইয়া পড়িল।

রাজু চক্রবর্ত্তী রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিল,—তোমরা সব দেখলে ত হে—বিলেস মুখুজ্যের কাণ্ডখানা একবার দেখলে? এত বড় ওর সাহস যে আমার চোখের সামনে জোতদারকে আমার মারপিট করে!

শ্রীবিলাসও তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—আর আপনিই বা কোন্ ভরসায় রাখাল মালাকারের মত একটা নিরীহ লোকের উপর

এমন ধারা অত্যাচার করেন ? ও বেচারা গরীব, নিতান্ত সহায় সম্বলহীন ; আপনাদের এ অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে ও সাহস করবে না,—এই ভরসায়,—না ?

গ্রামস্থ দুই একজন লোক মাঝখানে দাঁড়াইয়া রাজু চক্রবর্ত্তীর সামনে হইতে শ্রীবিলাসকে একটু সরাইয়া দিল। হরু ভটচায্যি রাজু চক্রবর্ত্তীর দিকে চাহিয়া একটু নিম্নস্বরে বলিল,—চেপে যাও —চেপে যাও ভায়া, এতটা বাড়াবাড়ি ভাল দেখায় না।

রাজু চক্রবর্ত্তীর চোখ দুইটা আমড়ার মত ফুলিয়া উঠিয়াছে। ভ্রূ কুঁচকাইয়া সে বলিল,—দেখ বিলেস মুখুজ্যে, তোমার বাড়াবাড়ি আমরা ঢের সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। তুমি কি মনে করেছ রাখালে মালীর মেয়েটাকে নিয়ে বেপরোয়া তুমি যা খুশি তাই ক'রে যাবে, আর গাঁয়ের এত বড় একটা ব্রাহ্মণ সমাজ চোখ বুজে তাই সহ্য করবে ?

শ্রীবিলাস অবাক হইয়া গেল। এ কথার কি জবাব দিবে সে ভাবিয়া পাইল না। রাজু চক্রবর্ত্তী পুনরায় কহিল,—তোমাকে আজ খোলাখুলি আমরা জানিয়ে দিচ্ছি,—আজ থেকে তুমি এক-ঘরে পতিত ; তোমার সঙ্গে এক পংক্তিতে ব'সে আর আমরা কেউ জল গ্রহণ করবো না।

শ্রীবিলাসের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণকাল সে নীরব রহিয়া রঘু চাটুজ্যে ও বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী প্রমুখ অন্যান্য মাতব্বরদের লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে বলিয়া উঠিল,—আপনারা—আপনারাও কি এই কথাই বলেন ?

বিজ্ঞের দল ঘাড় নীচু করিল। তাহাদের মনের ভাব যাহাই হোক, প্রকাশ্যে রাজু চক্রবর্ত্তীর বিরোধিতা করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। রাজু চক্রবর্ত্তী একটা তাড়া দিয়া বলিল,—খুলে তাই বল না হে সব, কার কি এতে বলবার আছে, বল না!

বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী ও রঘু চাটুজ্যে একটু কাঁচুমাচু করিতে লাগিল! হরু ভটচায্যি বলিয়া উঠিল,—নাচতে নেমে আর ঘোমটা কেন বাবা, যা বলতে চাও সব খুলে বল। তা যা বললে রাজকিশোর,* খাঁটী কথাই বলেছ; আমাদের সকলেরি এতে মত আছে।

অর্থাৎ শ্রীবিলাস মুখোপাধ্যায় গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ সমাজের বার, একঘরে—পতিত!

কাহারো মুখ হইতে প্রতিবাদের একটি শব্দও উত্থিত হইল না। শ্রীবিলাসের বুঝিতে বাকি রহিল না যে ব্যাপারটা একেবারে আকস্মিক নয়, রাজু চক্রবর্ত্তী তাহার বিরুদ্ধে পূর্ব্ব হইতেই প্রচারকার্য্য ও দলপুষ্টির চেষ্টা করিতেছিল; আজ সামনাসামনি একটা বোঝাপড়া করিতে চায়। শ্রীবিলাস শান্তকণ্ঠে কহিল,—আপনারা ঠিক জানেন কি—চক্রবর্ত্তী মশায় আমার বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তা কতখানা সত্য, অথবা আদৌ সে-কথা সত্য কি না, আপনারা ঠিক জানেন কি?

অপর কাহারো জবাব দিবার প্রয়োজন হইল না, রাজু চক্রবর্ত্তী সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—আলবাৎ, লক্ষী মালিনীর সঙ্গে

তোমার আসক্তির কথা কে না জানে! বলুক—এই রাখালে বেটাই বামুনের পায়ে হাত দিয়ে বলুক, এ কথা সত্যি কি না।

রাখাল মালাকারের অসহ্য হইয়া উঠিল, রাজু চক্রবর্ত্তীকে লক্ষ্য করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সে বলিয়া উঠিল,—সেও ভাল—চক্কোত্তি মশায়, আমি বলি সেও ভাল। বয়েসের দোষে যদি ওরা ন্যায় অন্যায় একটা কিছু করেও বসে, তবু আমি ওদের খুব বেশি দায়ী করবো না। কিন্তু চক্কোত্তি মশায়, একটা কথা আমি না বলে আর পারছি না।

বিক্ষুব্ধ রাখাল মালাকার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিল একবার রাজু চক্রবর্ত্তীর দিকে, মনের আবেগে সে বলিয়া চলিল,—এই আপনারা—সমাজের যারা বিধেনকর্ত্তা, তিনকাল গিয়ে যাদের এককালে ঠেকেছে, মজলিসে বসে যারা লম্বা লম্বা কথা বলে, আর ভারী ভারী শাস্তর আওড়ায়,—দুঃখের কথা বলবো কি চক্কোত্তি মশায়, তারা শুদ্ধ আমার মেয়েকে দেখে পাগল। হাজার বার লোক পাঠিয়ে খবর নেয়, টাকা পয়সা গয়নাগাঁটির লোভ দেখায়। ছি ছি চক্কোত্তি, ভেবেছ কি তোমার কোন খবরই আমি রাখি না!

রাজু চক্রবর্ত্তী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিল একবার রাখাল মালাকারের দিকে, তীব্রকণ্ঠে কহিল,—রাখালে!

রাখাল মালাকারের কথা শুনিয়া শ্রীবিলাস একবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাখাল মালাকার বলিয়া উঠিল,—আমাকে আর চোখ রাঙিয়ে কোন লাভ হবে না খুড়ো ঠাকুর, এ গাঁয়ের বসবাস আমার উঠবে, এ আমি আগেই জানতাম। গাঁ ছেড়ে আমি চলে যাব

আজই, এই রাত্রেই। তোমার সঙ্গে দেনা পাওনা আছে, ভিটেমাটী আমার পড়ে রইলো, যখন খুশি নিলেম ক'রে নিয়ো।

এই বলিয়া রাখাল মালাকার রুদ্ধশ্বাসে বুক চাপিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঢুকিল। লক্ষী আসিয়া রাখালের বুকে মুখ গুঁজিয়া একেবারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল; করুণকণ্ঠে বলিল,—বাবা!

রাখাল মালাকার সস্নেহে তাহাকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—কাঁদিসনে মা, সবই আমাদের বরাত। কিন্তু তোকে যে আমি চিনি, তুই কোন দুঃখু করিসনে মা!

লক্ষী রুদ্ধকণ্ঠে কহিল,—এতগুলো লোকের সামনে ওরা তোমার অপমান করলে, বাবা!

রাখাল মালাকার প্রশান্তকণ্ঠে নির্ব্বিকার চিত্তে কহিল,—তা করুক, ভগবান এর বিচার করবেন। এখন চল্ মা—গাঁ ছেড়ে আমাদের বেরুতে হবে, আমরা আর এখানে থাকবো না।

লক্ষীর মুখে চোখে ঘনাইয়া উঠিল এক নিবিড় ব্যথা। ভাঙ্গা গলায় সে বলিয়া উঠিল,—আর কি আমরা এ গাঁয়ে ফিরবো না বাবা?

রাখাল কহিল,—ঠাকুর জানেন, ফিরবার আর ইচ্ছা নাই মা, এই হয়ত শেষ।

মুহূর্ত্তের জন্য লক্ষীর চোখ দু'টি হঠাৎ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। রাখাল মালাকার পুনরায় কহিল,—গাঁয়ের লোকের লাথি জুতো খেয়ে, পদে পদে লাঞ্ছনা আর অপমান কুড়িয়ে, কি মোহে আর পড়ে থাকবো বল্! এর চেয়ে আমরা তীর্থে তীর্থে

ঘুরে বেড়াব, পথে পথে ভিক্ষে মেগে খাব, সেও আমাদের ভাল। পারবি না মা, বাইরের যত দুঃখু কষ্ট সহ্য করতে পারবি না ?

লক্ষী ধীরকণ্ঠে জবাব দিল,—খুব পারবো বাবা, সেই ভাল—এর চেয়ে সেই আমাদের ভাল।

রাখাল মালাকারের যথাসর্ব্বস্ব আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে শ্মশানের দৃশ্য। দুঃসহ এক নিবিড় ব্যথায় ক্ষণকালের জন্য রাখালের মনটা যেন টন টন করিয়া উঠিল। এই শ্মশানের মায়া যেন সে কোন মতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। এ যে তার সাত পুরুষের ভিটা, রাখালের মনে হইতে লাগিল তার সারা জীবনের যত কিছু সঞ্চয়, তার ঐহিক জীবনের সব চেয়ে প্রিয় বস্তুটি, এই শ্মশানের বুকেই কোথায় যেন একধারে সমাহিত হইয়া আছে। রাখাল চলিয়া গেলে হয়ত শৃগাল কুকুর আসিয়া কবর খুঁড়িয়া তাহাকে টানিয়া তুলিবে, দাঁত দিয়া তার সর্ব্বাঙ্গ হয়ত কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। রাখালের বত্রিশ নাড়িতে যেন মোচড় দিয়া উঠিল। কিন্তু এ মায়া, দুনিয়াটাই মায়া, এ মায়া যে রাখালকে কাটাইতেই হইবে।

রাখাল গিয়া ধীরে ধীরে তুলসীমঞ্চের সামনে দাঁড়াইল, যাবার আগে একটা প্রণাম করিয়া যাইবে। গড় হইয়া তুলসী তলায় প্রণাম করিয়া বাস্তুদেবতার উদ্দেশে যুক্তকর কপালে ঠেকাইল রাখাল, মনে মনে সে যুক্তকরে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল।

লক্ষী আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে রাখালের পিছনে। পাথরের মূর্ত্তির মত সে নিস্পন্দ। রাখাল প্রশান্ত দৃষ্টিতে লক্ষীর পানে

চাহিয়া সস্নেহে কহিল,—প্রণাম কর মা, শেষ বারের মত ঠাকুর তলায় একটি বার প্রণাম ক'রে নে, যাত্রার যে সময় হয়ে এলো।

লক্ষী নিরুত্তর। দুকুল ছাপা অশ্রুর বন্যায় চোখের তারা দু'টি তার ডুবিয়া গিয়াছে। রাখাল নিবিড়ভাবে লক্ষীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল,—কি হয়েছে মা, একদৃষ্টে অমন ক'রে চেয়ে আছিস কেন?

লক্ষী রাখালের বুকে মুখ লুকাইয়া অস্ফুটস্বরে কহিয়া উঠিল,—বাবা!

চঞ্চল হইয়া উঠিল রাখাল। আবার সেই মায়া! কাতর-কণ্ঠে কহিল রাখাল,—পারবি না মা, পারবি না এই ভিটের মায়া কাটাতে? কিন্তু আর যে কোন উপায় নাই মা, গাঁ ছেড়ে আমাদের যেতেই হবে যে!

রাখালের বুকে মুখ গুঁজিয়া ছটফট করিতে লাগিল লক্ষী।

রাখাল মালাকারের সদর দোরের সামনে জটলা চলিতেছে সমানে। শ্রীবিলাসের পাতিত্য অপরাধের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। রাখাল মালাকার প্রকাশ্য জনমণ্ডলীর সামনে অন্যায় ভাবে লাঞ্ছিত, মনের ধিক্কারে গৃহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প। রাজু চক্রবর্তীর সামনে চক্ষুলজ্জার খাতিরে মুখে যে যাই বলুক, এই অপ্রত্যাশিত বিসদৃশ ব্যাপারটিকে মনে মনে কেহই যেন সমর্থন করিতে পারিতেছে না। উপস্থিত গ্রামবাসীদের মধ্যে চাপা একটা বিক্ষোভের লক্ষণ যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীবিলাস

সমবেত ব্যক্তিবর্গকে, বিশেষ করিয়া রাজু চক্রবর্ত্তীর সমর্থক ব্রাহ্মণ সমাজের মাতব্বরগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—বৃন্দাবন খুড়ো, রঘুনাথদা, বয়ঃপ্রবীন ভটচায্যি মশায়, আপনারা সকলেই শুনুন, দু'একটা দরকারী কথা অতি সংক্ষেপে আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই।

সমবেত সকলেই উৎসুক ভাবে চাহিয়া আছে শ্রীবিলাসের দিকে। শ্রীবিলাস বলিতে লাগিল,—আমাকে যে একঘরে করা হবে, এ আমি জানতাম। সে জন্য আমি দুঃখু করি না, আমার শুধু দুঃখু হচ্ছে আপনাদের জন্য। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি—কেমন ক'রে আপনারা রাজু চক্রবর্ত্তীর মত একটা শয়তানকে সমাজপতি বলে মেনে নিয়ে পদে পদে তার অন্যায়গুলোকে এইভাবে সমর্থন ক'রে যাচ্ছেন!

রাজু চক্রবর্ত্তী রোষকষায়িত লোচনে চাহিয়া আছে শ্রীবিলাসের দিকে। হরু ভটচায্যি শুধু সংক্ষিপ্ত একটি প্রশ্ন করিল,—কি রকম?

শ্রীবিলাস কহিতে লাগিল,—ওর স্বরূপ ত আপনারা জানেন, দুনিয়ায় এমন কোন অপকর্ম্ম নাই, যা স্বার্থের খাতিরে রাজু চক্রবর্ত্তী আজ পর্য্যন্ত করেনি বা করতে পারে না। ওর সাম্প্রতিক মতিগতি সম্বন্ধে সকলের সামনে রাখাল মালাকার যে মোক্ষম কথাগুলো বলে গেল, আপনারা সব নিজের কানেই শুনলেন ত?

বৃদ্ধ হরু ভটচায্যি একটু গম্ভীর হইয়া বলিল,—তা কথাগুলো যেন কেমন কেমন একটু গোলমেলে ঠেকলো বটে, না কি বল বিন্দেবন?

রাজু চক্রবর্ত্তী রাগে আগুন হইয়া বলিল,—মিথ্যে—মিথ্যে—আগাগোড়া মিথ্যে।

শ্রীবিলাস পুনরায় কহিল,—কিন্তু তার চেয়েও একটা গুরুতর কথা—

রাজু চক্রবর্ত্তী একটা ধমক দিয়া বলিল,—তুমি থামো বিলেস মুখুজ্যে, বাক-চাতুরি ফলাবার জায়গা এটা নয়। তোমার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ আমরা চুকিয়ে দিয়েছি; তুমি এখন যেতে পার।

শ্রীবিলাস ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—চক্রবর্ত্তী মশায়, যেতে আমাকে হবেই—খুব সত্যি কথা; শুধু এখান থেকে নয়, হয়ত বা এ গাঁ থেকেই। যেখানে রাখাল মালীর মত সরল প্রাণ দুস্থ এক গ্রামবাসীর উপর এমন অন্যায় ভাবে জুলুম করা হয়, অথচ তার মৌখিক একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করতে কেউ সাহস করে না, সে ঠাঁই বিলেস মুখুজ্যের বসবাসের পক্ষে খুব লোভনীয় বলে সে মনে করে না।

বৃদ্ধ হরু ভটচায্যি কান খাড়া করিয়া শুনিতেছিল। ঘাড় নাড়িয়া সে বলিয়া উঠিল,—তা কথাটা অবশ্য মন্দ বলছে না বিলেস, না কি বল বিন্দেবন ?

শ্রীবিলাস বলিতে লাগিল,—আমি যাব, রাখাল মালাকার যদি গাঁ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়, আমিও আপনাদের বস্তাপচা ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের পায়ে গড় ক'রে এইখান থেকেই বিদেয় নেব।

এই বলিয়া শ্রীবিলাস চারিদিকে একবার চাহিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল,—কিন্তু যাবার আগে একটা কথা

সকলকে আমি জানিয়ে দিয়ে যাব। রাখাল মালাকারের ঘরে কে আগুন লাগিয়েছে, আপনারা জানেন ?

মথরো গোয়ালা মজলিসের একপাশে দাঁড়াইয়া জটলা শুনিতেছিল। হঠাৎ সে একটু চমকিয়া উঠিল।

রাজু চক্রবর্ত্তী ক্ষিপ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কে—কে আগুন লাগিয়েছে শুনি ?

শ্রীবিলাস তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল,—তুমি, মথরো গোয়ালাকে দিয়ে রাখাল মালীর ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছ তুমি।

রাজু চক্রবর্ত্তী চকিতে হঠাৎ গর্জ্জিয়া উঠিল,—কি—এত বড় আস্পর্দ্ধা, মথরো, একবার ইদিকে আয় ত।

মথুর গোপকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, ইতি মধ্যে সে ঝটিতি কখন সরিয়া পড়িয়াছে।

হরু ভটচায্যি একটু বিস্ময়ের সুরে কহিল,—না—না—এ কখনো হতে পারে না।

রঘু চাটুজ্যে সায় দিয়া বলিল,—রামো—এও কি একটা কথা হলো।

রাজু চক্রবর্ত্তী রাগে ফুলিতেছে, থর থর করিয়া সর্ব্বাঙ্গ তার কাঁপিতেছিল, ভ্রূকুটি মেলিয়া কম্পিত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল,—তোমাকে এ কথা প্রমাণ করতে হবে বিলেস মুখুজ্যে, সহজে আমি ছেড়ে দিব না।

হরু ভটচায্যি রাজু চক্রবর্ত্তীর কথায় সায় দিয়া বলিল,—অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে, যাচ্ছে তাই বললেই হলো নাকি !

শ্রীবিলাস সেই আলো আঁধারির মধ্যেই চারিদিক একবার লক্ষ্য করিয়া বলিল,—প্রমাণ চান? তা বেশ, প্রমাণ আমি করবো।

কাদি ঢুলেনী প্রায় গোড়ার দিক হইতেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। রাখাল মালাকারের প্রতিবেশী ফকির মালাকারের নাছ-দুয়ারে দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ হইতে সে জটলা শুনিতেছিল, শ্রীবিলাস আগেই লক্ষ্য করিয়াছে। কাদির দিকে চাহিয়া দূর হইতেই শ্রীবিলাস একটা ডাক দিয়া কহিল,—কাদি, এদিকে একটু এগিয়ে আয় ত।

হরু ভটচায্যি একটু বিস্মিত হইয়া বলিল,—কাদি আবার কি করবে?

কাদি ঢুলেনী সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। শ্রীবিলাস গিয়া তাড়াতাড়ি তার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। কাদিকে অনেক ভরসা দিয়া এক রকম জোর করিয়াই তাহাকে মজলিসের মাঝখানে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল শ্রীবিলাস।

রাজু চক্রবর্ত্তী ব্যস্ত হইয়া বলিল,—কাদি কেন, মজলিসের মাঝে কাদি কেন!

শ্রীবিলাস জবাব দিল,—এই কাদিকে দিয়েই আমি প্রমাণ করতে চাই। আমি জানি কাদি মিথ্যে বলবে না; রাখাল মালীর ঘরে কে আগুন লাগিয়েছে—একমাত্র কাদিই সে কথা জানে।

কাদি ঢুলেনীর মুখ শুকাইয়া গেল। রাজু চক্রবর্ত্তী সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—কাদি—কাদি আবার কি জানে!

শ্রীবিলাস জবাব দিল,—কাদি সব জানে, আমি শপথ ক'রে বলতে পারি কাদি সব জানে।

কাদি দুলেনী একটু ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল,—দোহাই ঠাকুর, আমাকে নিয়ে আর টানাটানি করো না, আমি ওসব কথা কেমন ক'রে জানবো!

রাজু চক্রবর্ত্তী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—ব্যস্—ব্যস্—আর আমরা কিছু শুনতে চাই না।

হরু ভটচায্যি বলিল,—কাদি দুলেনী কেমন ক'রে জানবে, এযে তোমার অন্যায় কথা বিলেস!

শ্রীবিলাস স্থির দৃষ্টিতে একবার কাদির দিকে চাহিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—তুই জানিস, আমার কাছে তুই স্বীকার করেছিস—তুই জানিস। মিথ্যে বলবার চেষ্টা করিসনে কাদি, চারিদিকে তোর এতগুলো ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে, মাথার উপর ভগবান। কোন ভয় নাই তোর, সত্য বল্।

কাদি দুলেনী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। শ্রীবিলাসের মুখের দিকে চাহিয়া কাদি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, নিজেকে যেন কোনমতেই আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

হরু ভটচায্যি কাদিকে একটু সাহস দিয়া বলিল,—জানিস যদি বল্—সত্যিই কিছু জানিস না কি?

কাদি হঠাৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—জানি।

শ্রীবিলাস আশ্বাস দিয়া বলিল,—বল্—কে আগুন লাগিয়েছে?

রাজু চক্রবর্ত্তী হঠাৎ তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—ও যদি মিথ্যে কথা বলে, তোমরা তাই বিশ্বাস করবে ?

হরু ভটচায্যি একটু বিরক্ত হইয়া বলিল,—আঃ—তুমি একটু থামো না রাজকিশোর !

শ্রীবিলাস পুনরায় কাদির দিকে চাহিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—না—না—কাদি মিথ্যে বলবে না, কাদি আমার কাছে স্বীকার করেছে। খুলে বল্ কাদি, রাখাল মালীর ঘরে কে আগুন লাগিয়েছে ?

কাদি দুলেনী বলিয়া উঠিল,—মথরো গোয়ালা।

কার হুকুমে ?

কাদি একেবারে ঘামিয়া উঠিয়াছে, রাজু চক্রবর্ত্তী একটা ধমক দিয়া বলিল,—মথরোকে তুই আগুন লাগতে দেখেছিস, মিথ্যুক হারামজাদী কোথাকার !

শ্রীবিলাস ভরসা দিয়া বলিল,—কোন ভয় নাই—বলে যা, মথরো গোয়ালাকে আগুন লাগাতে হুকুম দিয়েছিলো কে ?

কাদি দুলেনী বার দুই তিন ঢোক গিলিয়া মরিয়া হইয়া বলিয়া উঠিল,—রাজু ঠাকুর।

রাজু ঠাকুর, অর্থাৎ আমাদের স্বনামধন্য সমাজপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজকিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বরাবরেষু। কি ভটচায্যি মশায়, প্রমাণ হলো ত ?

এই বলিয়া কাদি দুলেনীর দিকে চাহিয়া শ্রীবিলাস পুনরায় বলিয়া উঠিল,—কি আর বলবো কাদি, কি বলে যে তোকে অভিনন্দন জানাব ! ইচ্ছে করছে তোকে মাথায় তুলে নাচি।

এই বলিয়া শ্রীবিলাস হো হো করিয়া একবার হাসিয়া উঠিল প্রাণখোলা হাসি। কাদি দুলেনী ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িল।

সমবেত গ্রামবাসিগণ বিস্ময়ে হতবাক, রাজু চক্রবর্ত্তীকে এতকাল তাহারা চিনিয়াও ঠিক চিনিতে পারে নাই। এত দূর সে নীচে নামিতে পারে, এ তাহাদের ধারণার বাইরে।

রাজু চক্রবর্ত্তী ঘামিয়া উঠিয়াছে। সহজে কিন্তু সে দমিবার পাত্র নয়, হুঙ্কার দিয়া সে বলিয়া উঠিল,—মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা, কোন্ শালা বলে আমি মথরো গোয়ালাকে দিয়ে আগুন লাগিয়েছি!

শ্রীবিলাস তীব্রকণ্ঠে কহিল,—কোন শালাই বলে নি, বলছে তোমার শালার সাক্ষাৎ সহোদরা শ্রীমতী কাদম্বরী দুলেনী, যাকে নিয়ে আজ বিশ বছর ধরে তুমি ঘরকন্না করছো। কি আর তোমায় বলবো রাজু চক্রবর্ত্তী, তুমি গুরুজন, বয়েসে আমার বাপের বড়। নৈলে তোমায় কি করতাম জান? ঠাই ঠাই ক'রে দু'গালে দু' চড় কষে দিয়ে তোমার চোয়াল দু'টি আমি ছাড়িয়ে দিতাম এই মুহূর্ত্তে।

শ্রীবিলাস রাগে ফুলিতে লাগিল। রাজু চক্রবর্ত্তী গর্জ্জিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—সাবধান বিলেস মুখুজ্যে—খুব সাবধান; রাজু চক্রবর্ত্তীর খপ্পরে পড়ে কেউ কোন দিন রেহাই পায়নি, এ কথাটা ভুলে যেয়ো না; তোমাকে যদি জব্দ ক'রে ছেড়ে দিতে না পারি ত গুপীনাথ চক্রবর্ত্তী আমাকে পয়দা করে নি।

এই বলিয়া রাজু চক্রবর্ত্তী সদলবলে স্থানত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেই শ্রীবিলাস বলিয়া উঠিল,—কিন্তু সে সুযোগ খুব শিগ্‌গীর তুমি আর পাবে না চক্রবর্ত্তী, তার আগেই তোমার শ্রীঘরের আমি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

রাজু চক্রবর্ত্তী হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী একটু বিস্মিত হইয়া বলিল;—কি তুই বলছিস বিলেস!

শ্রীবিলাস দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—এক্ষুনি আমি থানায় যাব, পুলিসে একটা খবর দিতে। রাখাল মালীর গৃহদাহের অপরাধে রাজু চক্রবর্ত্তীকে জেলে পুরবার ব্যবস্থা না ক'রে আর আমি ক্ষান্ত হব না।

রাজু চক্রবর্ত্তীর বুকের ভিতরটা একবার দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মুখে সে যতই বলুক, থানা পুলিশের হাঙ্গামা ত সে পোহাইতে চাহে না। দেশের আইন ত তাহাকে সমাজপতি বলিয়া খাতির করিয়া চলিবে না। ব্যাপার বেশী দূর গড়াইয়া গেলে রাজু চক্রবর্ত্তীর মান সম্ভ্রম প্রভাব প্রতিপত্তি সব কিছু যে ধূলায় লুটাইয়া পড়িবে! একি,—শ্রীবিলাসের নিকট শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে হার মানিয়া নতি স্বীকার করিতে হইল নাকি? সে অবস্থা কিন্তু অসহ্য।

নিশুতি রাতের জমাটবাঁধা অন্ধকার সহস্র দংষ্ট্রা মেলিয়া রাজু চক্রবর্ত্তীকে যেন চারিদিক হইতে ছোবল মারিতে লাগিল। রাজু চক্রবর্ত্তী একটা ঢোক গিলিয়া কহিল,—বৃন্দাবন!

বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী একটু ক্ষুব্ধভাবে চাপা গলায় বলিল,—মিটিয়ে

নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নাই। তুমি যে এতদিন আমাদিকে শুদ্ধ অন্ধকারে রেখে ইস্তক শুধু ধাপ্পা দিয়ে এসেছে, তা ত আগে বুঝতে পারিনি। এখন কোন্ দিক সামলাবে, সামলাও। আমরা এ অবস্থায় কিছু করতে পারবো না, এইটুকু শুধু জেনে রাখ।

বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তীর কথা শুনিয়া ও তার ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া রাজু চক্রবর্ত্তী একটু দমিয়া গেল। দলে তাহার ভাঙ্গন ধরিল নাকি, লক্ষণ বেশ ভাল বোধ হয় না; এ অবস্থায় একলা কি করিতে পারে রাজু চক্রবর্ত্তী!

মাথাটা হঠাৎ বোঁ করিয়া ঘুরিয়া গেল রাজু চক্রবর্ত্তীর, ধপ্ করিয়া সে রাস্তার উপর বসিয়া পড়িল।

শ্রীবিলাস থানায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এত বড় একটা অন্যায়কে কোনমতেই সে বরদাস্ত করিতে পারে না। এ সব হাঙ্গামা যাহাতে আর অধিক দূর না গড়ায়, তার জন্য কেহ কেহ চেষ্টা করিতেছিল; শ্রীবিলাস কিন্তু কোন কথাই শুনিতে চাহে না। রঘু চাটুজ্যে অনুযোগের সুরে কহিল,—বিলেস, কাজটা কি বেশ ভাল হবে?

হরু ভটচাযি্য একটু বোঝে কম। রঘু চাটুজ্যের কথার জের টানিয়া সে বলিয়া উঠিল,—থানা পুলিস যে করতে যাচ্ছো বাপু, মামলায় তোমার সাক্ষী দেবে কে, শুনি?

শ্রীবিলাস দৃপ্তকণ্ঠে কহিল,—সাক্ষী দেবেন আপনি, সাক্ষী দেবে রঘু চাটুজ্যে আর বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী, সাক্ষী দেবে আর আর

যারা দেখেছে, যারা শুনেছে। সাক্ষী দিতে আপনারা বাধ্য হবেন, সে ব্যবস্থা আমি করছি।

হরু ভটচায্যি একটু বিস্মিত হইয়া কহিল,—এঁ্যা—এ তুই কি বলছিস বিলেস!

শ্রীবিলাস জবাব দিল,—যা বলছি—খাঁটী কথাই বলছি, এর পর আর কথা নাই।

এই বলিয়া শ্রীবিলাস তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া দিল।

রাজু চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তীর একান্তে কি একটা বোঝাপাড়া চলিতেছিল। শ্রীবিলাস কিছু দূর অগ্রসর হইতেই বৃন্দাবন গিয়া তাড়াতাড়ি পিছন দিক হইতে একটা ডাক দিল,—বিলেস!

শ্রীবিলাস থমকিয়া দাঁড়াইল: তে-রাস্তার মোড়ে, ফকির মালাকারের দু'ফলা আমগাছটার নীচে। বৃন্দাবন গিয়া শ্রীবিলাসের কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—একটা মানী লোককে এইভাবে অপদস্থ ক'রে বিশেষ কোন লাভ হবে কি? গোটা গাঁয়ের যে এতে অপমান।

শ্রীবিলাসের ভ্রূ দুইটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল,—মানী লোকই বটে! শ্রীবিলাস একটু স্বর টানিয়া কহিল,—গাঁয়ের সমাজপতি বলে তার পদমর্য্যাদাটুকু এখনো আপনারা ষোল আনা বজায় রাখতে চান, না? কিন্তু রাখাল মালাকার—আপনাদের কাছে অন্ততঃ মানুষ হিসেবে তার কি কোন মূল্যই নাই! কই তার কথাটা একবার ভেবে দেখছেন না ত!

বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—আমি তোকে কথা দিচ্ছি বিলেস, রাখাল মালীর ঘরবাড়ী আমরা তৈরী করিয়ে দিব, যত টাকা লাগে।

একটা গভীর বেদনায় শ্রীবিলাসের সারা অন্তর মথিত হইয়া উঠিল। শ্রীবিলাস একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—বৃন্দাবন খুড়ো, যেভাবে আজ রাখাল মালীকে পীড়ন করা হয়েছে, অপমানের চরম আঘাতে লাঞ্ছিত করা হয়েছে তার অন্তরাত্মাকে,—সে কি কয়েকটা টাকা পয়সা দিয়েই উসুল ক'রে দেওয়া যায়! তা যায় না। কিন্তু আপনি—আপনি কেন টাকা দেবেন? এর জন্য দায়ী ত রাজু চক্রবর্ত্তী!

বৃন্দাবন জবাব দিল,—তার কথাই আমি বলছি, আমরা তাকে বাধ্য করবো রাখাল মালাকারের ক্ষতিপূরণ করতে।

এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া লইয়া শ্রীবিলাস বলিয়া উঠিল,—পারবেন —পারবেন তাকে বুঝিয়ে দিতে কত বড় অন্যায় সে করেছে?

বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী উত্তর দিল,—তাকে অনুতাপ করবার একটা সুযোগ দেওয়া দরকার, ওকে আমরা শুধরে নেব বিলেস! তা যদি না পারি, ওর সংসর্গ আমরা ত্যাগ করবো; সে কথা আমরা জানিয়ে দিয়েছি তাকে।

শ্রীবিলাস একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িল। এও কি সম্ভব! রাজু চক্রবর্ত্তীর মত একটা কুচক্রী শয়তানকে এত সহজে কি শুধরে নেওয়া সম্ভব হবে? যদি হয়—সে যে পরম একটা বিস্ময়, চরম একটা আবিষ্কার।

শ্রীবিলাস ভাবিতে লাগিল। বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী তার হাত ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল,—আয় আয়—আর পাগলামি করিসনে, ফিরে চল্।

শ্রীবিলাসকে টানিতে টানিতে বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী আবার তাহাকে রাখাল মালীর সদর দোরের সামনে লইয়া গিয়া হাজির করিয়া দিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে চাপা একটা গুঞ্জন চলিতেছে। রাজু চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে মুখোমুখি হইতেই শ্রীবিলাসের রক্ত আবার গরম হইয়া উঠিল। বহু কষ্টে উত্তেজনা দমন করিয়া ওদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতেই শ্রীবিলাসের দৃষ্টি পড়িল রাখাল মালাকারের সদ্যদগ্ধ ভিটেখানার দিকে। কি করুণ দৃশ্য, এ অপরাধের কি মার্জ্জনা আছে!

রাজু চক্রবর্ত্তী নিঝ্ঝুম একধারে বসিয়া আছে মাথায় হাত দিয়া। আজ কি সে দুনিয়ার চোখেই ছোট হইয়া গেল নাকি? 'ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে'—কথাটা হয়ত মিথ্যে নয়, বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী খাঁটী কথাই বলিয়াছে।

মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে রাজু চক্রবর্ত্তীর প্রেতাত্মার বুঝি নব জাগরণ সূচিত হইতে চলিয়াছে। কিসের যেন একটা প্রচণ্ড আঘাতে হঠাৎ যেন সে চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। শ্রীবিলাসের দিকে আগাইয়া গিয়া রাজু চক্রবর্ত্তী ভারী গলায় বলিয়া উঠিল,—বিলেস!

শ্রীবিলাস কি স্বপ্ন দেখিতেছে! রাজু চক্রবর্ত্তীর এ ভাবান্তর যে কল্পনাতীত। একি তার অনুতাপদগ্ধ অন্তরের অকপট অভিব্যক্তি, না নূতন কোন শয়তানী মতলব!

রাজু চক্রবর্ত্তী শুষ্ককণ্ঠে কহিল,—তোরা আমায় ক্ষমা কর বিলেস, তোদের উপর সত্যই আমি অবিচার করেছি।

ক্ষমা! কার কাছে ক্ষমা চায় রাজু চক্রবর্ত্তী?

শ্রীবিলাসের বিক্ষুব্ধ অন্তরাত্মা যেন তড়িৎ স্পর্শে আলোড়িত হইয়া উঠিল। ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল সে,—তা ত হয় না চক্রবর্ত্তী মশায়, আপনাকে ক্ষমা করবার অধিকার ত আমাদের নাই। যার কাছে আপনি সব চেয়ে বেশি অপরাধী, ক্ষমা চাইতে হবে আপনাকে তার কাছে। পারবেন রাখাল মালাকারের কাছে নতজানু হয়ে চোখের জলে তার মার্জ্জনা ভিক্ষা করতে? আছে আপনার সে সৎসাহস?

রাজু চক্রবর্ত্তী এতটুকু দ্বিধা করিল না। সঙ্গে সঙ্গে সে বলিয়া উঠিল,—বৃন্দাবন, ডাক একবার রাখালকে; আমার নাম করেই ডাক।

শ্রীবিলাস আপত্তি করিয়া বলিল,—রাখালকে ত আর ডাকা চলে না চক্রবর্ত্তী মশায়, যদি যেতে হয়—আপনাকেই যেতে হবে রাখালের কাছে, তার বাড়ীর মধ্যে।

বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী সায় দিয়া বলিল,—বেশ ত—ক্ষতি কি, একসঙ্গে আমরা সকলেই যাব রাখালের কাছে।

রঘু চাটুজ্যে একটু জোর দিয়া কহিল,—রাখাল ত আমাদের পর নয়, বিলেস!

শ্রীবিলাস তাহাদের অগ্রণী হইয়া কহিল,—আসুন তাহলে—এগিয়ে আসুন আমার সঙ্গে। কিন্তু তার আগে

প্রতিজ্ঞা করুন—রাখালকে আমরা কোনমতেই গাঁ ছেড়ে চলে যেতে দিব না।

এ বিষয়ে কাহারো দ্বিমত নাই, কেহই রাখালকে ছাড়িয়া দিতে চাহে না।

যাক—এও ভাল, রাখালের মনের ক্ষত যদি ইহারা মুছিয়া দিতে পারে, তবু শ্রীবিলাস মনে মনে একটু সান্ত্বনা পাইবে। অপরাধী বুঝুক যে সত্যই সে অপরাধী, এর বেশী আর চায় কি শ্রীবিলাস! এতক্ষণে শ্রীবিলাসের মনটা যেন তবু একটু হাল্কা হইয়া আসিল।

এক সঙ্গে সব দল বাঁধিয়া ঢুকিয়া পড়িল রাখাল মালাকারের বাড়ীর মধ্যে। শ্রীবিলাস উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাক দিল,—রাখাল!

সামনে কাহারও দেখা পাওয়া গেল না। শ্রীবিলাস আর একটু অগ্রসর হইয়া আর একবার ডাক দিল,—রাখাল, তোমার সঙ্গে এঁরা দেখা করতে এসেছেন; এদিকে এগিয়ে এসো।

কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। গভীর রাতের অন্ধকারে চারিদিক থম্ থম্ করিতেছে। শ্রীবিলাস একটু বিস্মিত হইয়া পুনরায় ডাক দিতে লাগিল,—রাখাল! রাখাল!

বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে জোর গলায় একটা হাঁক দিয়া কহিল,—রাখাল আছিস—রাখাল!

রাখাল কোন জবাব দিল না। লণ্ঠনের আলোয় চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখা হইল,—রাখাল মালাকার নাই।

শ্রীবিলাস চাহিয়া দেখে উঠানের চারিপাশে স্তূপীকৃত পড়িয়া আছে শ্মশানের কালো ছাই। রাখাল মালাকারের দেখা নাই। শ্রীবিলাস আর একবার ডাক দিল,—লক্ষী! লক্ষী!

লক্ষীরও কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। শ্রীবিলাসের চোখের সামনে রাখালের ভস্মীভূত কোঠাঘরখানা নিঝ্ঝুম দাঁড়াইয়া আছে বিরাট একটা প্রেত-কঙ্কালের মত!

কি আশ্চর্য্য, এরা তাহলে গেল কোথায়?

শ্রীবিলাসের কম্পিত কণ্ঠ হইতে আর একবার ধ্বনিত হইয়া উঠিল,—রাখাল! রাখাল!

রাখাল মালীর প্রতিবেশী ফকির মালাকার আসিয়া শ্রীবিলাসের সামনে দাঁড়াইল। ভাঙ্গা গলায় সে বলিয়া উঠিল,—ওরা চলে গেছে—বহুক্ষণ আগেই।

অপ্রত্যাশিত একটা আকস্মিক ধাক্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিল সকলেই। বাড়ীর পিছন দিক পানে শ্রীবিলাস খানিক আগাইয়া গিয়া চাহিয়া দেখে—খিড়কির দোর খোলা, দরজার পাল্লা দুইটা যেন অপরাধীর মত আড়ষ্টভাবে কোন রকমে খাড়া হইয়া আছে চৌকাঠের বাজু দুইটাকে আশ্রয় করিয়া। বিরাট একটা শূন্য সেই খোলা পথ দিয়া হাঁ করিয়া যেন চাহিয়া আছে রাখাল মালাকারের পরিত্যক্ত ভিটেখানার দিকে।

শ্রীবিলাস খিড়কী দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল, দাঁড়াইল গিয়া বাড়ীর পিছন দিকের খোলা মাঠটার উপর। জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, চারিদিকে শুধু জমাটবাঁধা অন্ধকার; মাথার উপর মিট্

মিট্‌ করিয়া তারা জলিতেছে। দূরের পানে চাহিয়া শ্রীবিলাস প্রাণপণ শক্তিতে আর একবার চীৎকার করিয়া উঠিল,—রাখাল! রাখাল!

শ্রীবিলাসের অনুসঙ্গীরা তাড়াতাড়ি গিয়া চারিদিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী সান্ত্বনার সুরে কহিল,—সে চলে গেছে; এ নিয়ে আর আপসোস করে কোন লাভ নাই, এ তার নিয়তি।

শ্রীবিলাস তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল,—কিন্তু নিজে থেকে ইচ্ছে ক'রে ত যায় নি ওরা, এই ভাবে তাদের গাঁ ছেড়ে চলে যেতে আপনারাই বাধ্য করেছেন। কিন্তু যাক সে কথা,—আপনারা এখন যান, আমি আর বাড়ী ফিরবো না।

এই বলিয়া শ্রীবিলাস সামনের সুঁড়ি পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিল। দূরের পথ যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। নিশ্চিন্ত গৃহবাস শ্রীবিলাসের পক্ষে কোনমতেই আর সম্ভব নয়। গ্রামের শত বন্ধন এতকাল তাহাকে সহস্র পাকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল, আজ কিন্তু এক মুহূর্ত্তে সে বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। শ্রীবিলাস আজ মুক্ত, একেবারে মুক্ত। চকিতে শুধু একটি বার শ্রীবিলাসের মনে পড়িল ক্ষান্তমণির কথা। কিন্তু ক্ষান্তমণির কাশীবাসের ব্যবস্থা ত সে করিয়া দিয়াছে, দুই একদিনের মধ্যেই বুড়া রাইজীকে সঙ্গে লইয়া ক্ষান্তমণি রওনা হইয়া যাইবে। তবে আর শ্রীবিলাসের চিন্তা কি, কোথায় তার বন্ধন!

লক্ষ্মী মালিনীর মুখখানি শ্রীবিলাসের মনে জ্বল জ্বল করিয়া ভাসিয়া উঠিল। আজ যে সে গৃহহারা, হয়ত বা শ্রীবিলাসের জন্যই, অন্তরের অন্তস্তল হইতে একথা আজ কেমন করিয়া অস্বীকার করিবে শ্রীবিলাস!

ভাবিতে ভাবিতে সে হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

সমবেত গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা বিষাদের ছায়া যেন ঘনাইয়া উঠিয়াছে। হরু ভটচায্যি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বলিয়া উঠিল,—দাঁড়িয়ে কি দেখছিস বিন্দেবন, বিলেসকে তোরা যেমন করে হোক ফিরিয়ে আন। গাঁ ছেড়ে ও চলে গেলে কিছুতেই আমাদের ভাল হবে না। ওরে কে আছিস, কান্তমণিকে একটা খবর দে দেখি।

বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী রঘু চাটুজ্যে ও আরও কয়েকজন গ্রামবাসী মিলিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া শ্রীবিলাসের পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী তার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—বিলেস, এ সব কি ছেলেমানুষী করছিস, ফিরে আয়!

শ্রীবিলাস জবাব দিল,—তা আর হয় না বৃন্দাবন খুড়ো, এখানে আর আমি টিঁকতে পারবো না, গাঁ ছেড়ে আমাকে যেতেই হবে।

রঘু চাটুজ্যে একটু অনুযোগের সুরে কহিল,—কি এমন হয়েছে বাপু, যার জন্যে তোকে গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হবে! ফিরে আয়, পাগলামি করিসনে।

শ্রীবিলাস ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল,—তোমাদের এ অনুরোধ আমি রাখতে পারলাম না, তার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু তোমাদের এই

উদারতা, এই সহানুভূতি এতক্ষণ কোথায় ছিলো রঘুনাথদা, কই রাখাল মালাকারকে ত তোমরা ধরে রাখতে পারলে না। ওরা গরীব, অস্পৃশ্য, ছোটলোক বলে তোমাদের এতখানি দম্ভ, না ?

রঘু চাটুজ্যে নির্ব্বাক, হরু ভটচায্যি মাথা চুলকাইতে লাগিল। শ্রীবিলাস পুনরায় বলিয়া উঠিল,—কিন্তু একটা কথা আমার বলা হয় নি এখনো, যাবার আগে বলেই যাই,—আমি কিন্তু ওদের ভালবাসি, অন্তরঙ্গ আপন জন বলে আমার সারা অন্তর দিয়ে ওদের আমি ভালবাসি। ওরা আমায় ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। তাদের এই মহাদুঃখের দিনে আমি কি তাদের ভুলে থাকতে পারি !

হরু ভটচায্যি একটু বিস্মিত ভাবে কহিল,—এ তুই কি বলছিস বিলেস, একটা হা-ঘরে ছোটলোকের জন্যে তুই কি শেষে দেশান্তরী হবি নাকি !

শ্রীবিলাস একটা ধমক দিয়া বলিল,—আপনি থামুন ভটচায্যি মশায়, ভদ্রলোক বলে নিজেদেরকে আর জাহির করবেন না। আপনাদের মত মুখোস পরা তথা কথিত ভদ্রলোকের চেয়ে আমি নিরক্ষর ওই ছোট লোকদের সংসর্গ ঢের বেশী লোভনীয় বলে মনে করি।

এই বলিয়া শ্রীবিলাস বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তীর হাত ছাড়াইয়া আগাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বৃন্দাবন নিবিড় ভাবে শ্রীবিলাসকে চাপিয়া ধরিয়া ঈষৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল,—বিলেস, নিতান্তই শুনবি না আমাদের কথা !

শ্রীবিলাস ছটফট করিতে লাগিল। উদ্‌ভ্রান্তের মত সে বলিয়া উঠিল,—ছাড়—ছাড়, তোমরা আমার পথ ছেড়ে দাও। ওরা যে আমায় ডাকছে, আমি যে ওদের ডাক শুনতে পাচ্ছি! আমি যাব—তোমরা আমার পথ ছেড়ে দাও।

এই বলিয়া শ্রীবিলাস জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া সামনের সেই সুড়ি পথ ধরিয়া ক্ষিপ্র বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

রাখাল মালাকার ও লক্ষী এতক্ষণ হয়ত বহু দূর চলিয়া গিয়াছে। কে জানে,—তাহাদের নিরুদ্দেশ এই যাত্রাপথের শেষ কোথায়!

অন্ধকারে পথঘাট চেনা যায় না। শ্রীবিলাস ধানক্ষেতের আলপথ ধরিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। পিছনে ফেলা গ্রামখানি মায়ের মত নিবিড় স্নেহে শ্রীবিলাসকে বুঝি বারে বারে পিছু ডাকিতেছে,—ফিরে আয়, ওরে ফিরে আয়! শ্রীবিলাস আর ফিরিল না, মেঠোপথ ধরিয়া আগাইয়া চলিল। দিগন্তবিথারী নূতন ধানের মঞ্জরীগুলি শ্রীবিলাসের পায়ে পায়ে যেন শতেক বাঁধনে জড়াইয়া ধরিয়া আলপথের উপর লুটাইয়া পড়িতেছে। শ্রীবিলাস চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে,—রাখাল! রাখাল!

কোন সাড়া নাই। নিশুতি রাতের নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া দূরে শুধু প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল। শ্রীবিলাস আগাইয়া চলিয়াছে, পুনরায় সে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল,—লক্ষী! লক্ষী!

শ্রীবিলাসের অহেতুক গৃহত্যাগের সংবাদ পাইয়া কান্তমণি শ্রীদাম বৈরাগীকে সঙ্গে লইয়া হন্ত দন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। যেমন করিয়া হোক শ্রীবিলাসকে বাড়ী ফিরাইতে হইবে।

ভিন্‌গাঁয়ের সেই সুড়িপথ ধরিয়া অন্ধকারেই ক্ষান্তমণি ছুটিতে আরম্ভ করিল। শ্রীদাম বৈরাগী ব্যস্ত হইয়া বলিল,—এলোপাথাড়ি অমন ক'রে ছুটো না পিসি মা ঠাকরুণ, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে যে!

ক্ষান্তমণি আকুল কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল,—বিলেস! বিলেস! ফিরে আয়—ওরে ফিরে আয়।

সে ডাক শ্রীবিলাসের কানে পৌছিল কিনা কে জানে। কোন দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই, সুমুখ পানে লক্ষ্য রাখিয়া চীৎকার করিয়া সে ডাকিয়াই চলিয়াছে,—রাখাল! রাখাল! লক্ষী!

ক্ষান্তমণি ডাকিতে লাগিল,—বিলেস! বিলেস!

হেমন্তের হিমেল হাওয়ায় কথা কয়টি ভাসিতে ভাসিতে দূরে কোন্ দিগন্তের বুকে গিয়া রুদ্ধ আবেগে যেন আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল:—

—রাখাল! রাখাল।

—লক্ষী! লক্ষী!

—বিলেস!